স্মৃতি-মন্দির

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

১৩২৬ ফাল্গুন।

মূল্য দুই টাকা।

First Eight forms were printed at
The Beauty Press.

Next eight forms (from 9 to 16)
Printed by Pulinbehari Das,
from Debakinandan Press,
66, Manicktola Street, Calcutta.

বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, দেবোপম চরিত

আমার পূজ্যপাদ মাতুল

৺বীরেশ্বর পাঁড়ে

মহোদয়ের পুণ্যপূত নামে আমার এই

'স্মৃতি-মন্দির'

পরম ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত হইল।

স্মৃতি-মন্দির

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ সাবিত্রী-ব্রত—সাবিত্রী এই ব্রতের ফলে মৃত পতিকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। স্বামিপূজার এমন দিন আর নাই। কণিকা সুন্দরী স্বামিপূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে স্বামিগৃহে আগমন করিয়া, তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র। এত অল্প বয়সে তাঁহাকে এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে সকলেই নিষেধ করিয়াছিলেন; এজন্য তখন তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত গ্রহণ করা হয় নাই। দুই বৎসর হইল, তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী শ্রীশচন্দ্র যে স্থানেই থাকুন, তাঁহার যতই গুরুতর কার্য্য থাকুক, সাবিত্রী ব্রতের দিন তাঁহাকে বাটীতে আসিতেই হইবে। কারণ, শ্রীশচন্দ্র জানেন, ব্রতান্তে তাঁহার পদপূজা না করিয়া কণিকা কোনমতেই জলগ্রহণ করিবে না।

একাদশবর্ষ বয়সে কণিকার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাহার শ্বশুর বা শাশুড়ী কেহই জীবিত ছিলেন না; সেই জন্য কণিকার মাতা সুহাসিনী দেবীর শ্রীশচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কণিকার পিতা শশিশেখর বাবু শ্রীশচন্দ্রের নির্ম্মল চরিত্র, উচ্চ শিক্ষা এবং সচ্ছল অবস্থা দেখিয়া, পত্নীর অভিপ্রেত না হইলেও শ্রীশচন্দ্রের সহিত কণিকার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বৎসরই শ্রীশচন্দ্র এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভূতত্বে প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে সরকারী বিশ্লেষণকারীর পদ প্রাপ্ত হন; কিন্তু শ্রীশচন্দ্র সে চাকরী গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। বাল্য কাল হইতেই চাকরীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাব ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি ছোট-নাগপুর, নাগপুর, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে বিবিধ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া কার্য্যোপযোগী তিনটি স্থান মনোনীত করেন এবং সেই তিনটি স্থানে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্য স্বত্বাধিকারীদিগের নিকট হইতে অধিকার গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি ধলভূমে একটি বেলে পাথরের পাহাড়ও পাট্টা করিয়া লইয়া, সেই পাথরের কার্য্যই প্রথমে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অবস্থা সচ্ছল হইলেও তাঁহার তাদৃশ মূলধন ছিল না; এই জন্য পাথরের কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়ে তাঁহাকে কিছু ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দুই বৎসরের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া তৃতীয় বৎসরে কলিকাতায় একটি বাসাবাটী ভাড়া

লইয়া পত্নীকে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন। পত্নী ভিন্ন সংসারে তাঁহার আর কেহই ছিল না, এবং তাঁহাকে অনেক সময় বিদেশে থাকিতে হয়, সেই জন্য শ্রীশচন্দ্রের এক দূর সম্পর্কীয়া মাসীমাতা কণিকাসুন্দরীর অভিভাবিকা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের বাটীতে আগমন করিলেন।

কমলা তখন শ্রীশচন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; পাথরের কার্য্যে, তাঁহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল। পর বৎসর তিনি পূর্ব্বগৃহীত তিনটি খনির মধ্যে একটির কার্য্য আরম্ভ করি-লেন। দুই বৎসর পরে আশানুরূপ না হউক, সেই কার্য্যেও শ্রীশচন্দ্রের অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল। তিনি এই বারে দ্বিতীয় খনির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিন বৎসর অক্লান্ত চেষ্টা ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে শ্রীশচন্দ্রের দ্বিতীয় খনি হইতেও অর্থলাভ হইতে লাগিল এবং ছয় মাসের মধ্যে সুদে আসলে শ্রীশচন্দ্রের সমুদয় টাকা আদায় হইয়া গেল। শ্রীশচন্দ্র এই সময় কলিকাতায় নিজের মনোমত বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। কমলা চঞ্চলা হইলেও শ্রীশচন্দ্রের নিকট বাঁধা পড়িলেন। প্রেমময়ী পতিপরায়ণা সুশীলা সুন্দরী পত্নী, অক্ষুণ্ন স্বাস্থ্য, অর্থের অভাব নাই, সুতরাং শ্রীশচন্দ্রের দিন অতি সুখেই কাটিতেছিল।

কণিকার একমাত্র দুঃখ, তাহার সন্তান হইল না। ব্রত-নিয়ম স্বস্ত্যয়ন, কবচ ধারণ প্রভৃতি নানারূপ অনুষ্ঠানেও যখন আশা পূর্ণ হইল না, তখন কণিকা একদিন শ্রীশচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করিতে বলিলে, শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "কণা, যদি ভাগ্যে থাকে.

তোমারই সন্তান হইবে; আর যদি আমার সন্তান-ভাগ্য না থাকে, একটি কেন পাঁচটি বিবাহ করিলেও হইবে না। তোমার মুখে ও-কথা শুনিলে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। তুমি দুঃখ করিও না, সন্তান হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা।” সুতরাং কণিকা ভবিষ্যতে আর কখনও স্বামীকে পুনরায় বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হয় নাই।

কণিকার বয়স এক্ষণে দ্বাবিংশতি বৎসর। এই বৎসর শ্রীশচন্দ্র তাঁহার অবশিষ্ট তৃতীয় খনির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ই সেই স্থানে থাকিতে হয়, মধ্যে মধ্যে বাটী আসেন এবং অন্যান্য কর্ম্মস্থল পরিদর্শন করিতে গমন করেন; কাজেই এ বৎসর কণিকার সহিত তাঁহার এক সঙ্গে দুই চারি দিনের অধিক দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কণিকা একদিন তাঁহাকে বলিল—“এত পরিশ্রম করিয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিবার কি আবশ্যক, ভগবান আমাদের যাহা দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট; এ কষ্ট—এ পরিশ্রম কাহার জন্য?”

শ্রীশচন্দ্র বুঝিলেন, মুখে প্রকাশ না করিলেও সন্তানের জন্য কণিকার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত; তিনি পত্নীকে আদর করিয়া স্নেহ-মাখা স্বরে বলিলেন, “তোমার জন্য কণা, তুমি সুখে থাকিবে বলিয়া।”

“আমি কি অসুখে আছি? আমার অসুখ, আমি বৎসরের মধ্যে এক সঙ্গে কখন পনের দিনও তোমার সেবা করিতে পাই না। এ সম্পদ, এ অর্থ, এ পরিশ্রম কিসের জন্য? তুমি যাহা

করিয়াছ, যথেষ্ট ; আমাদের জীবনে আমাদের কোন অভাবই হইবে না। তুমি অর্থের জন্য আর ছুটাছুটি করিও না।"

পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "আর অধিকদিন তাঁহাকে এই কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে না ; এবারে চাকিয়ার খনির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, অল্পদিনের মধ্যেই খনির সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে।" তাহার পরে হাসিয়া বলিলেন, "আর বেশী দিন তোমাকে বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না, তোমার সাত রাজার ধন এই মাণিকটি এইবার ফিরিয়া আসিয়া তোমার এই অঞ্চলে"—এই বলিয়া সহসা শ্রীশচন্দ্র পত্নীর অঞ্চল টানিয়া লইয়া আপনার গলায় জড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এমনি বাঁধা থাকিবে।"

কণিকা সস্মিত লজ্জারক্ত মুখে শ্রীশচন্দ্রের নিকট সরিয়া আসিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি বুঝি তাই বলছি ?"

"সে কি আর তুমি মুখে বলছো, মনে মনে বলছো ; আমি তোমার মনের দরজায় উঁকি দিয়া সব দেখিতে পাইতেছি।"

প্রীতি হাস্যোজ্জ্বল মুখে কণিকা বলিল, "মনের আবার দরজা আছে না কি ?"

"তা বুঝি জান না ! এক যোড়া—এই দিকে—সরে এস আমি দেখিয়ে দিচ্চি" বলিয়া শ্রীশচন্দ্র পত্নীকে নিকটে টানিয়া আনিয়া তাহার দুইটি হরিণ নয়নে চুম্বন করিয়া "এই মনের দরজা দেখতে পেয়েছ ?"

"কি কর, ছিঃ ! চারি দিকে লোকজন রয়েছে, তোমার একটুও লজ্জা নাই !"

"একটুও না" বলিয়া শ্রীশচন্দ্র পুনরায় কণিকাকে ধরিতে যাইতেছিলেন, কণিকা পলায়ন করিল।

কয়েক দিন পরে শ্রীশচন্দ্র চাকিয়ায় গমন করিলেন। যাত্রা-কালে কণিকা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিল, সাবিত্রী ব্রতের দুই দিন পূর্ব্বে যেন অবশ্য অবশ্য বাটী ফিরিয়া আসা হয়। শ্রীশচন্দ্র নিশ্চয় আসিবেন বলিয়া পত্নীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কণিকা প্রত্যহ তাঁহাকে পত্র লিখিত এবং ব্রতের দুই দিন পূর্ব্বে বাটী আসিবার কথা ভুলিয়া যাইতে নিষেধ করিত, শ্রীশচন্দ্রও পত্রোত্তরে, ব্রতের দুই দিন পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আসিবেন লিখিতেন; কিন্তু ব্রতের কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীশচন্দ্র কণিকাকে লিখিলেন, একটী বিশেষ কার্য্যের জন্য ব্রতের দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার বাটী যাওয়া হইবে না, ব্রতের দিন প্রাতঃকালে তিনি বাটীতে পৌঁছিবেন।

কণিকা অতি প্রত্যূষেই শয্যাত্যাগ করিয়া, স্নান করিয়া, স্বামীর জন্য চা প্রস্তুতের জল চড়াইতে বলিয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ছয়টার সময় বম্বেমেল আসিবে, তাহার পূর্ব্বেই গাড়ী ষ্টেশনে গিয়াছে। সাড়ে ছয়টা বাজিল, ওই গাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে, কণিকা গাড়ীর অপেক্ষায় রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল। "এ কি গাড়ী গাড়ীবারাণ্ডায় প্রবেশ না করিয়া আস্তাবলের দিকে গেল! তিনি কি আসেন নাই! কেন? কি হইল! তাঁহার ত আজ সকালে নিশ্চয় আসিবার কথা, কেন আসিলেন না।" সহসা কোনরূপ অভাবনীয় বিপদাশঙ্কায় কণিকার হৃদয় যেন

কাঁপিয়া উঠিল; সেই সময়ে দাসী আসিয়া বলিল, "মা, বাবু আসেন নি।"

"জানি, তুই একবার মোহিত কে ডেকে দে।"

দাসী প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই মোহিতকুমার কণিকার নিকট আসিয়া বলিলেন, "কি দিদি!"

"তোমার দাদার ত এই গাড়ীতেই আসিবার কথা ছিল, কিন্তু এ গাড়ীতে ত তিনি আসিলেন না, আর কখন গাড়ী আসিবে?"

"দেখে বলছি" বলিয়া মোহিতকুমার একখানি টাইমটেবেল লইয়া আসিয়া বলিলেন, "বেলা একটায় একখানি গাড়ী আসিবে, আর একখানি সন্ধ্যা সাতটায়; দাদা নিশ্চয় একটার গাড়ীতে আসিবেন; বোধ হয়, মেল ধরিতে পারেন নাই।"

"একটার আগে গাড়ী পাঠাইয়া দিও" বলিয়া কণিকা আপন কক্ষে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল, তাহার মন অত্যন্ত অস্থির হইল। সে ভাবিতে লাগিল, কেন আসিলেন না? তিনি ভাল আছেন ত? কোন অসুখ হয় নাই ত? আমার মন এমন ব্যাকুল হইল কেন? অনেক চিন্তা করিয়াও কণিকা তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। পরে ভাবিল, আমি অনর্থক দুশ্চিন্তা করিতেছি; তিনি নিশ্চয়ই একটার গাড়ীতে আসিবেন, মেলগাড়ী ধরিতে পারেন নাই, তাই সকালে আসিতে পারেন নাই। কণিকা এই সিদ্ধান্ত করিয়া মন স্থির করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার অন্তর তাহাতে প্রবোধ না মানিয়া যেন হা-হা করিয়া উঠিল, কে যেন তাহার অন্তস্তল হইতে হঠাৎ বলিয়া

উঠিল, "তোমার সকল সুখের শেষ হইয়াছে, তিনি আর আসিবেন না।" কণিকা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল; তাহার মন পুনরায় যেন কোন অব্যক্ত আকস্মিক ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। এই সময়ে শ্রীশচন্দ্রের মাসীমাতা আসিয়া বলিলেন, "আজি ব্রতের দিনে তুমি আবার এখন সকালবেলা শুয়ে পড়লে কেন মা?"

"আমার শরীরটা, কেমন কচ্চে মাসী মা, আমি উঠতে পারব না। তুমি সব দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা কর।"

মাসীমাতা আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি চলিয়া যাইলে কণিকা ভাবিতে লাগিল, যদি কোন দুর্ঘটনা হইয়া থাকে, যদি তিনি পীড়িত হইয়া থাকেন, যদি—কণিকা আর ভাবিতে পারিল না, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল সে শুইয়া পড়িল; ঠিক তখনই দাসী একখানি পত্র হস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা, তোমার পত্র, সরকার মশায় দিলেন।" পত্রের উপরের হস্তাক্ষর দেখিয়া কণিকা স্বামীর পত্র চিনিতে পারিল এবং আগ্রহ সহকারে দাসীর হস্ত হইতে পত্র লইয়া পত্র খুলিয়া দুই খানি পত্র পাইল; একখানি তাহার স্বামীর, অন্য খানি অপর লোকের। কণিকা স্বামীর পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে "ভগবান" বলিয়া খাটের উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পতনের শব্দে, মাসীমাতা ও দাসী কণিকার গৃহে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, ছিন্নলতিকার ন্যায় কণিকা মেজের উপর পড়িয়া আছে; তাহার হস্তে একখানি পত্র—কপাল কাটিয়া গিয়াছে এবং সেই ক্ষত স্থান হইতে দরদরধারে শোণিত নির্গত হইতেছে। "মেসোমশায় শীঘ্র

উপরে আসুন, মা পড়ে গেছেন" বলিয়া দাসী বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মোহিতকুমার তখন সরকার মহাশয়কে বাজারের ফর্দ্দ লিখাইয়া দিতেছিলেন; দাসীর চীৎকার শুনিয়া, তিনি দ্রুতপদে কণিকার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাসীমা তখন কণিকার আহত স্থানে জলপটী বাঁধিয়া দিয়া রক্তস্রোত নিবারণ করিয়া তাহার সংজ্ঞা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে ছিলেন। মোহিতকুমার আসিলে তাঁহারা তিন জনে ধরাধরি করিয়া কণিকাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ সুশ্রূষার পরে কণিকার চৈতন্য হইল; সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিল, "আমার কপালে এমন বেদনা হইয়াছে কেন?" পরক্ষণেই তাহার স্বামীর পত্রের কথা স্মরণ হইল, সেই পত্র পড়িতে পড়িতে কেমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন তাহার হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরে কি হইয়াছে, তাহার স্মরণ নাই। কণিকার কথা শুনিয়া মাসীমা বলিলেন, "তোমাকে যে ফিরে পেয়েছি মা, এই রক্ষে! তুমি যে পড়া পড়েছিলে, মাগো, রক্তে এখনও মেজেয় ঢেউ খেলছে" বলিয়া মাসীমা শিহরিয়া উঠিলেন। পরে পুনরায় বলিলেন, "মোহিত, বাবা, শীঘ্র ডাক্তার আন্‌তে পাঠাও।" কণিকা বলিল, "না না মাসীমা, ডাক্তার ডাকতে হবে না, হঠাৎ কেমন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়াছিলাম, এখন একটু শুয়ে থাকলেই সুস্থ হব।"

"ডাক্তার ডাকতে পাঠাও মা, কি জানি, কিসে কি হয়; কপালটা বড্ড কেটে গেছে! মেসোমশায় তুমি মার কথা শুন না, ডাক্তার ডেকে আন।"

দাসীর কথা শুনিয়া মোহিতকুমার বলিলেন "ডাক্তার ডাকতে পাঠাই দিদি?" "না ভাই আর ডাক্তার ডাকতে পাঠাতে হবে না, তুমি একবার আধঘণ্টা বাদে এখানে এস।" মোহিতকুমার প্রস্থান করিলে মাসীমাতা বলিলেন, "হ্যাঁ বউমা, তা ডাক্তার ডাকতে বারণ কল্লে কেন, একবার এসে দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করে যেত।" ক্ষীণহাস্যের সহিত কণিকা উত্তর করিল, "ডাক্তার ডাকার মত কিছু হয় নি মাসী মা।"

"কি জানি মা শীরিশ বাড়ীতে নেই, তাই ভয় হয়।"

"কিছু ভয় নেই মাসীমা। তোমরা যাও, একটু শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে।"

সকলে প্রস্থান করিলে কণিকা পুনরায় স্বামীর পত্রখানি পাঠ করিল :—

"কণিকা, কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সন্দেহ হইয়াছিল, যেন তুমি আর আমাকে লইয়া সুখী নও, কিন্তু আমি সে সন্দেহকে মনে স্থান দিই নাই, ভাবিয়াছিলাম অমূলক সন্দেহ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। এখন জানিতে পারিলাম, আমার সে সন্দেহ ভিত্তিহীন নহে। আমার হৃদয়ে এ কঠিন আঘাত সহ্য হইল না, আমার সব শেষ হইল, আমি চির বিদায় হইলাম, তোমার সুখের পথের কণ্টক হইব না বলিয়া বিদায় হইলাম। আমার সহিত এ জীবনে আর তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও, তোমার সব রহিল।"

শ্রীশ

এ পত্রের অর্থ কি! কিসের সন্দেহ—সে কি করিয়াছে!

স্বামীর মনে ব্যথা দিবার কোন কার্য্য করিয়াছে বলিয়া ত তাহার স্মরণ হয় না। তবে বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাত কেন! সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার স্বামী, তাহার দেবতা, তাহার ইহলোক পরলোকের সর্ব্বস্ব তাহাকে এরূপ কঠোর পত্র লিখিলেন! সন্দেহের কার্য্য সে ত কিছুই করে নাই। সে যে স্বামী ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই জানে না। তবে তিনি কেন এরূপ পত্র লিখিলেন, অনেক চিন্তা করিয়াও কণিকা তাহা স্থির করিতে পারিল না; হঠাৎ স্বামীর পত্রের সহিত আর একখানি পত্রের কথা তাহার স্মরণ হইল; সে পত্রখানি তাহার শয্যার উপরেই পড়িয়াছিল। কণিকা সেই পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিল।

প্রতিপালক বরেষু—

আপনার নুন খাইয়াছি এবং খাইতেছি। অসময়ে আপনি দয়া-পরবশ হইয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদানে আপনাকে এই কঠিন সংবাদ দিতে হইবে জানিতে পারিলে আমি পূর্ব্বেই আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতাম। আপনার এ বিশ্বাসঘাতক পিশাচ ভ্রাতাটিকে কোথা হইতে আপনার সুখের সংসারে আনয়ন করিয়াছিলেন? উহার মুখ দেখিলে পাপ হয়; উহাকে অবিলম্বে আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন। লোকে কাণাকাণি করিতেছে, শীঘ্রই এই কলঙ্কের কথা সাধারণের জল্পনার বিষয় হইবে। আপনি বুদ্ধিমান এবং বিবেচক; ইহার অধিক আর আমি লিখিতে পারিলাম না। তবে শুনিয়াছি, আপনার এই ভ্রাতাটি নাকি আবার সম্পর্কে আপনার ভায়রা ভাই।

আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আপনার দয়ার প্রতিদানে আপনার সরল উদার সন্দেহশূন্য হৃদয়ে যে এরূপ বজ্রাঘাত করিতে হইল, তজ্জন্য আমি অন্তরে যে কি যাতনা পাইতেছি, তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে পারিবে না।

আপনার আশ্রিত।

পত্রের শেষভাগ ছিন্ন, যে পত্র লিখিয়াছে তাহার নাম নাই।

"কি সর্ব্বনাশ! এ পত্র কে লিখিল! আমি তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি! মোহিত যে আমার ছোট ভাই; তাহার সহিত আমার নামে কলঙ্ক! আমার যে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে ইচ্ছা করিতেছে—আমি যে স্বপ্নেও কখন লোকের মন এত নীচ, এত ক্রূর, এত সন্দিগ্ধ হইতে পারে, ভাবি নাই! কে আমার এই সর্ব্বনাশ করিল! কি হবে! কি হবে! কে আমার এ কলঙ্ক মোচন করিবে? আমার স্বামী আমার দেবতা যে এই কথা বিশ্বাস করিয়াছেন! মা ভগবতী সতী রাণি, আমি কি করিব বলিয়া দাও! ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইল না কেন! মা শঙ্করী! আমার যন্ত্রণার অপেক্ষাও যে আমার স্বামীর আমার দেবতার যন্ত্রণা সহস্র গুণ অধিক! আমি কি করিব!" নিদারুণ যন্ত্রণায় কণিকার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু নির্গত হইল না! এ দুঃখ চক্ষুজলে ধৌত হয় না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে, মোহিতকুমার আসিয়া কণিকার মূর্ত্তি দেখিয়া অন্তরে ভীত হইল। সেই সদাহাস্যমুখী প্রফুল্লমনা জগদ্ধাত্রীর মুখে কে যেন বিষাদের কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে। এ যেন

আর সেই দয়াময়ী ফুল্লমুখী কণিকা নয়, এ যেন কণিকার বিষাদ-দগ্ধ ছায়া। কণিকা মোহিতের হস্তে পত্র দুইখানি দিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু সে দৃষ্টি মোহিতকে দেখিতেছিল না, সে দৃষ্টি যেন তাহাকে ভেদ করিয়া কোন অজ্ঞাত প্রদেশের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়াছিল। মোহিত প্রথমে শ্রীশচন্দ্রের পত্র, পরে বেনামী পত্রখানি পাঠ করিয়া "দিদি!" বলিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া হুতাশ বায়ু যেন "দিদি" বলিয়া তাহার মুখবিবর হইতে বহির্গত হইল। তাহার হৃদয়ের সেই কাতর ধ্বনি শুনিয়া কণিকার চক্ষে জল আসিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভাই!" মোহিত, আর কোন কথা কহিতে পারিল না, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া, উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে মোহিত মুখ তুলিয়া কণিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "কি হবে দিদি!"

"বাবাকে টেলিগ্রাম কর, তিনি যেন আজই আসেন। আর মাসীমাকে বল, বাবা আসিবার পূর্ব্বে যেন কেহ আমাকে বিরক্ত না করে।"

মোহিতকুমার ভগ্ন হৃদয়ে শ্বশুরকে টেলিগ্রাম করিতে গমন করিলেন। কণিকা উঠিয়া গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নদীয়া জেলার সাহপুরগ্রামে শশিশেখর বাবুর বাস। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোক, কোন কাজকর্ম্ম করেন না, পৈতৃক কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতেই এক রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যায়। শশিশেখরের দুই কন্যা ও একটি পুত্র; জ্যেষ্ঠা কণিকার সহিত শ্রীশচন্দ্রের এবং মধ্যমা মাধুরীর সহিত মোহিতকুমারের বিবাহ হইয়াছিল। পুত্র অখিলচন্দ্র সকলের কনিষ্ঠ, তাহার বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবে। শশিশেখর বাবু অদৃষ্টগুণে স্বল্প ব্যয়ে সৎপাত্রে দুই কন্যাকেই সম্প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে আর এক্ষণে সংসারের চিন্তায় বিব্রত থাকিতে হয় না। তাঁহার পত্নী সুহাসিনী দেবী শ্রীশচন্দ্রের সহিত কণিকার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; তাহার কারণ, শ্রীশচন্দ্রের সংসারে অন্য স্ত্রীলোক নাই, কণিকার কষ্ট হইবে; কিন্তু শশিশেখর পত্নীর আপত্তি থাকিলেও শ্রীশচন্দ্রের মত পাত্রে কন্যাদান করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। সুহাসিনী দেবীও এক্ষণে কন্যার সৌভাগ্যে মনে মনে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। শশিশেখর সময়ে সময়ে শ্রীশচন্দ্রের সহিত কণিকার বিবাহে অমতের জন্য সুহাসিনী দেবীকে কত পরিহাস করিতেন; তাহাতে তিনি বলিতেন, "আমার মেয়ের ভাগ্যে এরূপ জামাই হইয়াছে, নইলে বাপ মা কি আর

দেখিয়া শুনিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে ত্রুটী করে? তবে সকলের সমান হয় না কেন? যার যেমন ভাগ্য।" যাহা হউক, কন্যার সুখসৌভাগ্যে তিনিও মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

সাবিত্রী ব্রতের দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কণিকার কনিষ্ঠ সহোদর অখিলচন্দ্র আসিয়া মাতাকে বলিল, "হ্যাঁ মা তুই যে বলিছিলি সাবিত্রী ব্রতের দিন আমরা কলকাতায় বড়দিদির বাড়ী যাব।"

সুহাসিনী দেবী বলিলেন, "বলেছি ত যাবো।"

ক্ষুণ্ণ স্বরে অখিল বলিল, "কই যাওয়া হলো—আজ ত সাবিত্রী ব্রত।"

"আজ ব্রত!" যেন চমকিত হইয়া অখিলের মাতা বলিলেন, "আজ ব্রত?"

অ।—না তো কি, নিবারণ কাকা যে বাবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

সু।—ওই যা, তাহ'লে বাবা,আমি ভুলে গিয়াছিলাম। তা যাক গে, এখন না হয় যাওয়া নাই হলো, এই কটা দিন পরে তোর বড়-দিদিকে নিয়ে শ্রীশ আসবে, তুই তোর দিদির সঙ্গে কলকাতায় যাস্।

অ।—হ্যাঁ তোমরা বুঝি যেতে দেবে, সেবারে শ্রীশ দাদা আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে বাবা যেতে দিলেন না।

সু।—তুমি এখানকার পড়াটা শেষ কর, তারপর কলকাতায় গিয়ে দিদির কাছে থেকে পড়াশুনা ক'রো।

অ।—কলকাতায় বুঝি আর এখানকার পড়া হয় না?

অখিলের মাতা কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সেই সময়

বহির্ব্বাটী হইতে "বাড়ীতে কে আছেন গো, শশিশেখর বাবুর নামে একখানি টেলিগ্রাম আছে" শুনিয়া সুহাসিনী বলিলেন, "অখিল বাবা, দৌড়ে যাও—দেখ, কি টেলিগ্রাম এল।" অখিলচন্দ্র মাতার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই বহির্ব্বাটীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এক্ষণে তিন লম্ফে প্রাঙ্গণ পার হইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিল। টেলিগ্রামের নাম শুনিয়া সুহাসিনী দেবী অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, কিসের টেলিগ্রাম—কে করিল! হঠাৎ তাহার কণিকার কথা, মোহিতের কথা ও শ্রীশচন্দ্রের কথা মনে হইল। তাহাদের কোন অসুখবিসুখ হইল না ত! আশঙ্কায় তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, তিনি উৎকণ্ঠার সহিত অখিলের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই অখিলচন্দ্র নাচিতে নাচিতে টেলিগ্রাম লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুহাসিনী বলিলেন,"কোথাকার টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখ।" মাতার আজ্ঞা পাইয়া অখিলচন্দ্র টেলিগ্রামখানি খুলিলেন, কিন্তু তিনি মাইনার স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের বিদ্যা লইয়া টেলিগ্রামের সেই পেনসিলের জটিল লেখা আয়ত্ত করিতে পারিলেন না; অনেক কষ্টে বিডনস্কয়ার নয়তিরিশ পড়িয়া ফেলিলেন। সুহাসিনী বিডনস্কয়ারের নাম শুনিয়া টেলিগ্রাম কলিকাতা হইতে আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া টেলিগ্রামের সংবাদ জানিবার অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া অখিলকে শীঘ্র তাহার পিতাকে বাটীতে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। অখিল বলিল "বাবাকে নিবারণ কাকা ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন, তিনি কি এখন আসবেন।"

"টেলিগ্রাফের কথা শুনলেই আসবেন, দৌড়ে যাও লক্ষ্মী বাবা আমার।"

অখিল পিতাকে ডাকিতে গেল, সুহাসিনী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শশিশেখর পুত্রের নিকট টেলিগ্রাম আসিয়াছে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। নিবারণবাবুও টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনিও টেলিগ্রামের সংবাদ জানিবার জন্য শশিশেখর বাবুর সহিত আসিয়াছিলেন। শশিশেখর টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া নিবারণবাবুকে বলিলেন, "নিবারণ, আমাকে এখনি ক'লকাতায় যেতে হবে. তোমার ওখানে মধোকে দেখে এলাম, তুমি বাড়ী গিয়ে তাকে এখনি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" নিবারণবাবু বলিলেন, "দাদা খবর কি? ভাল ত।"

"খবর কিছুই লেখে নি ভাল মন্দ জানবো কি করে। মোহিত লিখছে, শীঘ্র আসবেন, বড় জরুরি।"

নিবারণবাবু চলিয়া গেলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁগা শুধু যেতে লিখেছে, আর কিছু লেখেনি, তারা সব ভাল আছে ত?"

"কেমন করে জানবো! আর টেলিগ্রামে বেশী কথা লেখাও চলে না। তুমি আমার কাপড়চোপড় আর গোটা পঁচিশেক টাকা বার করে দাও, অখিল হ্যারিক্যানটায় তেল বাতি আছে কি না দেখ্; যদি না থাকে, শীগ্‌গির করে তেল পূরে দে" বলিয়া শশিশেখর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে গৃহিণী

টাকা ও বস্ত্রাদি গুছাইয়া লইয়া আসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ গা এখন সন্ধেবেলা কি করে যাবে ?"

"হেঁটে যেতে হবে।"

"এই আলসে কাল, সাপ পোকড়ের ভয়, গাড়ী করে গেলে হয় না ?"

"গাড়ী করে গেলে, সকালের গাড়ীতে ক'লকাতায় যেতে হয়, হেঁটে গেলে খ'ড়ে পার হ'য়ে মাণিকপুরে গিয়ে রাত্রি দশটার গাড়ী ধরতে পারবো, একটার সময় ক'লকাতায় পৌছাব।"

"খাওয়া দাওয়ার কি হবে ?"

"পথে জল টল খেয়ে নেবো, আর একটা রাত্রি না খেলেই বা কি হয়।"

"না না পথ হেঁটে গিয়ে রাত উপোষ করে থেক না।"

ইত্যবসরে মধুসূদন নাথ ওরফে মধো যুগি আসিয়া শশিশেখরকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদা ঠাকুর ডেকেছেন কেন ?" মধোকে দেখিয়া শশিশেখর বলিলেন, "এসেছিস্, চল আমার সঙ্গে তোকে মাণিকপুর যেতে হবে।"

"কবে ?"

"কবে কিরে এখনি, আমি রাত্রি দশটার ট্রেণে ক'লকাতায় যাব, ঐ আলোটা হাতে করে নে, চল আর বিলম্ব করিস্ নে।"

"একটা দোছুট নিয়ে আসবো না ?"

"এতো আর কুটুম বাড়ী যাচ্ছিস না, চল, রাত্রে রাত্রে যাবি আবার ভোরে উঠে চলে আসবি।"

"দাঁড়ান দাদাঠাকুর, একগাছা লাঠি নিয়ে আসি, রাত্তির কালে শুধু হাতে পথ চলতে নেই।"

"বাহিরের ঘরে লাঠী আছে নিয়ে শিগ্গীর আয়, দেরী হয়ে যাচ্চে এর পরে আর গাড়ী পাওয়া যাবে না।"

মধু লাঠী আনিতে গেল, সুহাসিনী বলিলেন, "কালই চিঠি দিও, পরশু যদি আমি চিঠি না পাই, নিবারণ ঠাকুর-পোকে সঙ্গে করে ক'লকাতায় যাব।"

শশিশেখর পত্নীর কথার উত্তরে "আচ্ছা আচ্ছা" বলিয়া অগ্রসর হইতে না হইতেই লগুড় হস্তে মধুসূদন আসিয়া "চলো দাদাঠাকুর" বলিয়া হ্যারিকেনটি উঠাইয়া লইয়া অগ্রসর হইল। শশিশেখরও "দুর্গা দুর্গতি নাশিনী" বলিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। সুহাসিনী দেবীও "দুর্গা দুর্গা" বলিতে বলিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সদর পর্য্যন্ত আসিলেন। শশি-শেখর দৃষ্টি পথের বাহিরে গমন করিলে তিনি অন্দরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময়ে মাধুরী ছুটিয়া আসিয়া বলিল "হ্যা মা বাবা কি চলে গেছেন ? ক'লকাতার খবর কি ?"

"খবর ত কিছু জানিনে মা, মোহিত ওঁকে যাবার জন্য টেলিগ্রাফ করেছে।"

"তা কাল সকালে গেলেই ত হতো।" মাধুরীর কথা শুনিয়া অখিল বলিল "তা আর হতোনা ; তোর যেমন হাঁদা বুদ্ধি।" অখিলচন্দ্রের সহিত তাহার মেজ দিদির আদৌ বনিবনাও ছিল না। দুইজনে দিন রাত্রি নানা প্রকার কলহ হইত, অখিলের

কথায় মাধুরী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "না তোর বড় বুদ্ধি, ধেড়ে ছেলে, আজও সেকেন্ ক্লাসে পড়চিস্, তোর কথা কইতে লজ্জা করেনা?"

"তোর বর এণ্ট্রেন্স পাস করেছে বলে, তোর অত গুমোর, দেখিস আমিও কতগুলো পাস করি।" সুহাসিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আচ্ছা আচ্ছা বাবা, তোরা এখন ঝগড়া রাখ। মনটা ভাল নেই আর খিরকিচ করিস নে।" ভাই বোনের বাক্য যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল, সুহাসিনী তখন তাহাদিগকে বলিলেন "চল্ ঘরের মধ্যে চল; এ আলসে কালে সন্ধ্যার সময় বাহিরে থাকতে নেই।" অখিলচন্দ্র তখন শিষ্ট বালকের ন্যায় মাধুরীর নিকট গিয়া বলিল "মেজদি গোলকধাম খেলবি?"

মাধুরী গোলকধাম খেলিতে অত্যন্ত ভালবাসিত, সে বলিল "খেলবো," তাহার পরেই ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল দুইজনে ভাল খেলা হয় না, নিবারণ কাকার বাড়ী থেকে যদি নিধু আর হেমাকে ডেকে আনতে পারিস তাহলে চারজনে খেলি।"

মাধুরীর কথায় অখিলচন্দ্র কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই সুহাসিনী দেবী বলিলেন "না না, এ অন্ধকারে আর ওবাড়ী গিয়ে কাজ নেই। ঘরে আয় আমি তোদের সঙ্গে খেলবো" এই বলিয়া তিনি পুত্র কন্যাকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ট্রেণ আসিবার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে শশিশেখর বাবু মাণিক-পুর ষ্টেসনে উপনীত হইলেন। মধুসূদনকে জলখাবারের পয়সা দিয়া তিনি আফিস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মাণিকপুরের নাইট ষ্টেসন মাষ্টারটি কিঞ্চিৎ রুক্ষ প্রকৃতির ছিলেন, তিনি শশি-শেখর বাবুকে আফিসের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "বাহিরে যান।" শশিশেখর বলিলেন, "কলিকাতার গাড়ীর আর কত বিলম্ব আছে জানিতে পারি কি?" মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "ঘণ্টা হইলেই জানিতে পারিবে।" শশিশেখর সেরূপ লোককে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া বাহিরে আসিলেন। তিনি হাঁটিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত ষ্টেসন গৃহে একটু বিশ্রাম করিবেন কিন্তু ষ্টেসন মাষ্টারের ব্যবহারে তাঁহার সে ইচ্ছা দূর হইয়া গেল। তিনি বাহিরে আসিয়াই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার বাবু "রামসিং" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, রামসিংও "যাতাহায়" বলিয়া দূর হইতে সাড়া দিল, মাষ্টার বাবু বলিলেন "গাড়ী ছোড়া—ঘণ্টা।" অল্পক্ষণ মধ্যে রামসিং আসিয়া ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি করিতে লাগিল; মাষ্টার বাবু একটি ঘুল ঘুলি খুলিয়া "টিকিট টিকিট, কে

টিকিট নেবে"? বলিতে কয়েক ব্যক্তি সেখানে টিকিট লইতে গেল, শশিশেখরও গৃহের মধ্যে আসিয়া মাষ্টার বাবুর সম্মুখে একখানি দশটাকার নোট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "সিয়ালদহ সেকেণ্ড ক্লাস রিটার্ণ।" শশিশেখরকে পুনরায় গৃহের মধ্যে দেখিয়া মাষ্টার বাবু মহা গরম হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের কথা শুনিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া অগ্রে শশিশেখরকে টিকিট দিলেন, এবং তাঁহার কোন লগেজ আছে কি না, লোক আবশ্যক আছে কি না ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নানারূপে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন; শশিশেখরও ভদ্রতানুযায়ী উত্তর দিয়া টিকিট লইয়া বাহিরে আসিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ী আসিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইল, শশিশেখর একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর দরজা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে তিন চারি জন আরোহী শয়ন করিয়া আছে; সে গাড়ী ছাড়িয়া একটু অগ্রসর হইয়া তিনি একখানি খালি গাড়ী পাইয়া তাহাতেই উঠিয়া বসিলেন। রাত্রিকালে অনভ্যাসে চারি ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর, তাহার উপর শরীরও নিতান্ত কৃশ নয়, আবার পাছে গাড়ী ধরিতে না পারেন সেই ভয়ে তিনি যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া আসিয়াছেন, এই জন্য তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া তিনি জুতা খুলিয়া বেঞ্চের উপর শয়ন করিলেন, পা দুই খানি গাড়ীর জানালা দিয়া বাহির করিয়া দিলেন; পায়ে ফোসকা পড়িয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে-

ছিল। বাহিরের শীতল বায়ু লাগিয়া তাঁহার পায়ের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ উপশম হইল এবং অত্যন্ত ক্লান্তি বশতঃ তিনি অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রিত হইলেন।

গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেসনে পৌঁছিলে কলরবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দেখিলেন, শিয়ালদহ ষ্টেসন, সুতরাং নামিতে হইবে, কিন্তু জুতা পায়ে দিবার সময় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল, যাহা হউক সভ্যতার খাতির না রাখিলে চলে না, সুতরাং কষ্ট হইলেও তিনি জুতা পায়ে দিয়া খোঁড়া-ইতে খোঁড়াইতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। টিকিট দিয়া তিনি গেটের বাহিরে আসিতেই, শ্রীশচন্দ্রের সহিস সেলাম দিয়া "হুজুর গাড়ী এ দিকে আছে আসুন" বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

মোহিত কুমার গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়ী গাড়ীবারাণ্ডার নিম্নে প্রবেশ করিতেই তিনি অগ্রসর হইয়া গাড়ার দরজা খুলিয়া দিলেন। শশিশেখর মোহিতকে দেখিয়া বলিলেন "কে বাবা মোহিত, খবর ভাল ত? কণিকা ভাল আছে, শ্রীশ ভাল আছে?"

"আজ্ঞা হাঁ, আপনি নেমে আসুন সব বলছি।"

শশিশেখর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মোহিতের সহিত তাহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। মোহিত তাঁহার হস্তে শ্রীশচন্দ্রের প্রেরিত পত্র দুইখানি দিয়া বলিল, "দিদি এই পত্র পাঠ করিতে করিতে খাটের উপর হইতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত

হইয়াছিলেন, কপাল কাটিয়া গিয়াছে ; তাহার পরে আপনাকে টেলিগ্রাম করিতে বলিয়া ঘরে দরজা দিয়া সেই সকাল বেলা হইতে শুইয়া আছেন, আর বাহিরে আসেন নাই, আপনি না আসা অবধি তাঁহাকে ডাকিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।”

পত্র পাঠ করিয়া শশিশেখর স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “এ পত্র কে লিখেছে ?”

মোহিত বলিল, “বলিতে পারি না, দাদার পত্রের সহিত আসিয়াছে।”

“আমাকে কণিকার নিকট লইয়া চল।” বলিয়া শশিশেখর সেই স্থানে জুতা খুলিয়া রাখিয়া মোহিতের সহিত কণিকার গৃহের দিকে গমন করিলেন। কণিকার গৃহের দ্বার ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ ছিল। শশিশেখর দ্বারে আঘাত করিয়া বলিলেন “কণিকা মা, দরজাটা খুলে দাও, আমি এসেছি।” পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কণিকা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। গৃহ অন্ধকার দেখিয়া মোহিত সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। কণিকার মূর্ত্তি দেখিয়া শশিশেখরের চক্ষে জল আসিল। তাহার সোনার বর্ণ একদিনেই কালি হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত মুখ শুষ্ক ও পাংশুবর্ণ।

পিতাকে দেখিয়া কণিকা “বাবা” বলিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল। হতাশার হাহাকার যেন কণিকার মুখ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় নির্গত হইয়া শশিশেখরের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কি বলিয়া তিনি কন্যাকে সান্ত্বনা দিবেন, সান্ত্বনার কি আছে ? তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভূমিতলেই কণিকার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

মোহিত ম্লান মুখে দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কণিকা বলিল "বাবা, আমি ত কোন অপরাধ করি নাই; কি পাপে আমার এ শাস্তি হইল?" কণিকার চক্ষে অশ্রু নাই, স্বরে মধুরতা নাই, সে যেন একটি যন্ত্র; যন্ত্রের ন্যায় তাহার মুখ হইতে কথাগুলি বাহির হইল। শশিশেখর তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন "ভয় কি মা, আমি কালই চাকিয়ায় গিয়া শ্রীশকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব, তুমি উঠে মুখে জল দাও। সমস্ত দিন উপবাস ক'রে আছ, কিছু আহার কর।"

"আমার ক্ষুধা নাই, আমি কিছুই খাইব না—অখিল, মাধুরী মা সকলে ভাল আছে ত বাবা?"

"হাঁ, সকলেই ভাল আছে, তাঁদের জন্য তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আমি সন্ধ্যার সময় টেলিগ্রাম পাই, সেই জন্য হেঁটে মাণিকপুরে এসে রাত্রি দশটার ট্রেণ ধরি।"

মো।—তা হলে আপনারও ত খাওয়া দাওয়া হয় নাই?

শশি।—না, কিন্তু কণিকা না খেলে আমিও কিছু খাব না।" শশিশেখরের কথা শুনিয়া কণিকা বলিল "আমি কিছুই খেতে পারবো না বাবা, তুমি খাওগে।" কিন্তু শশিশেখর কণিকা না খাইলে কোন মতে আহার করিতে সম্মত হইলেন না, অগত্যা কণিকা আহার করিতে সম্মত হইল। শশিশেখর মোহিতকে বলিলেন, বাবা মোহিত, "আমাদের দু'জনের খাবার এখানে আনিতে বল, আমি আজ আমার মায়ের সঙ্গে বসে খাব।"

সন্ধ্যার পরে পুরোহিত আসিয়া ব্রত আরম্ভ করিবার

জন্য মাঠাকরুণকে ডাকিয়া দিতে বলিলে মাসি মা বলিলেন, তাহার শরীর ভাল নাই, সে উঠিতে পারিবেনা, আপনার যাহা আবশ্যক হয় আমাকে বলুন।" পুরোহিত মাসীমার নিকট হইতে ব্রতের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি (অবশ্য পাওনা গণ্ডাও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল) বুঝিয়া লইয়া, ব্রত শেষ করিলেন এবং ব্রতান্তে ব্রত কথা নিজেই শ্রবণ করিয়া আহারান্তে দ্রব্যসম্ভার ও দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন। নিমন্ত্রিত লোক জনের বহুপূর্ব্বে আহারাদি হইয়া গিয়াছিল, কেবল গৃহিণীর আহার হয় নাই এজন্য বাটীর অন্য লোক জন সকলে অভুক্ত ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শশিশেখর ও কণিকার আহার্য্য আসিল, নিতান্ত অনিচ্ছা থাকিলেও কণিকা পিতার সহিত আহারে বসিল. কিন্তু সে কিছুই খাইতে পারিল না দেখিয়া শশিশেখর অবশেষে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে একটু দুগ্ধ পান করাইলেন। আহারান্তে শশিশেখর মোহিতের সহিত তাহার পাঠগৃহে গমন করিয়া সরকার মহাশয়কে ডাকাইয়া শ্রীশচন্দ্রের প্রেরিত চিঠিখানির প্রথম ছত্র তাঁহাকে দেখাইয়া সে লেখা তিনি চিনেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে সরকার মহাশয় চশমা বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইয়া সেই লেখা দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন "এত রামেশ্বর বাবুর লেখার মত দেখছি।" শশিশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন "রামেশ্বর বাবু! রামেশ্বর বাবু কে ?"

মো।—রামেশ্বর বাবু বলিয়া একটি ভদ্রলোক এখানে থাকেন।

শশি।—সেই রামেশ্বর নাকি সরকার মশায় ?

সর।—আজ্ঞা হাঁ, এ-লেখা তাঁরই হাতের ব'লে বোধ হচ্চে।

শশি।—আপনার নিকট রামেশ্বর বাবুর কোন লেখা আছে?

সর।—আজ্ঞে আছে বই কি, আজই তিনি আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শশি।—সেই চিঠিখানি একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।

সরকার মহাশয় চিঠি লইয়া আসিলে শশিশেখর দুই খানি চিঠি মিলাইয়া দেখিলেন দুইখানিরই হস্তাক্ষর এক, কোন তফাৎ নাই। শশিশেখর সরকার মহাশয়কে বিদায় দিয়া পত্র দুইখানি মোহিতের হস্তে দিয়া বলিলেন "গত বৎসর রামেশ্বর যখন জরিমানার টাকা না দিতে পারায় শ্রীঘরে যাইতেছিল, শ্রীশ টাকা দিয়া তাকে খালাস করিয়া আনে। আমি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়াছিলাম, তাকে বাটীতে আনিবার কি প্রয়োজন? তাহাতে শ্রীশ বলিয়াছিলেন ও বড় গরীব, ভদ্র লোকের ছেলে খেতে পায় না, এখানে থাকবে আর যা হয় কাজ-কর্ম্ম ক'রবে, আমি বিশেষ ক'রে বলিয়াছিলাম; অজ্ঞাত কুলশীল কোন লোককে বাটীতে রাখতে নাই, তোমার ইচ্ছা হয় উহাকে একটা মাসহারা বন্দোবস্ত করে দাও, কিন্তু শ্রীশ আমার কথা না শুনে দুধ দিয়ে এই কাল সাপ পুষলে।"

মো।—এখন কি করা উচিত বিবেচনা করেন।

শশি।—ওকে কালই বাড়ী থেকে দূর করে দাও।

মো।—আমরা বললে সে যদি না যেতে চায়?

শশি।—যাতে যায় তার ব্যবস্থা আমি করবো। এখন আমায় একটা শোবার জায়গা দেখে দাও, তুমিও শোওগে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে শশিশেখর কণিকাকে বলিলেন "মা, তোমার কুৎসা ক'রে যে শ্রীশকে এই পত্র লিখেছিল তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

কণিকা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"কে বাবা ?"

শশি।—তোমাদের রামেশ্বর।

ক।—আমাদের রামেশ্বর! আমাদের বাটীতে যে রামেশ্বর বাবু থাকেন—তিনি ?

শশি।—হাঁ।

ক।—আমি ত তাঁর কাছে কোন অপরাধ করি নাই, তিনি কেন এমন কাজ করলেন ?

শশি।—উপকার এবং লবণের প্রতিদান! তাকে এখান থেকে দূর ক'রে দিতে হবে।

ক।—আপনার যা ভাল বিবেচনা হয় করুন।

শশি।—তোমার বাড়ী, তুমি না হুকুম দিলে সে আমার কথা শুনবে কেন ?

ক।—কিন্তু যদি—

শশিশেখর কণিকার ইতস্ততঃ করিবার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "যদি শ্রীশ কিছু বলে ?"

কণিকা উত্তর করিল না; শশিশেখর পুনরায় বলিলেন "সে জন্য তোমায় চিন্তা ক'রতে হবে না, আমি শ্রীশকে ব'লব, আমি তাড়িয়ে দিইছি।

ক।—তবে দাসীকে দিয়ে তাঁকে বলে পাঠাই।

শি।—দাসীকে দিয়ে ব'লে পাঠালে হবে না; ভূপাল সিংকে ডেকে তাকে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দেবার হুকুম তোমাকে দিতে হবে।

ক।—আমিত জমাদারের সঙ্গে কথা কইনা বাবা!

শি।—কথা কবার আবশ্যক নাই। তোমার অভিপ্রায় জমাদার বুঝতে পারলেই হবে। তুমি দাসীকে দিয়ে জমাদারকে এইখানে ডাকতে পাঠাও।

কণিকা জমাদারকে ডাকিতে পাঠাইল। জমাদার ভূপালসিংহ প্রায় আট বৎসর হইল শ্রীশচন্দ্রের নিকট আছে। শ্রীশচন্দ্র যখন প্রথম পাথরের কার্য্য আরম্ভ করেন সেই সময়ে ভাগ্যগুণে তিনি এরূপ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভূপাল সিংহের মাতুল পুলিশে চাকরী করিতেন; তিনি ভূপালকে পুলিশে চাকরী করিয়া দিবেন বলিয়া দেশ হইতে আনাইয়াছিলেন; কিন্তু ভূপাল সিংহের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যবশতঃ ভূপাল তাহার মাতুলের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোকের পুলিশে স্থানান্তরিত হন। ভূপাল আসিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িল। শ্রীশচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের নিকট রাখিলেন। ভূপালসিং অল্প লেখা-পড়া জানিত, এবং অত্যন্ত বিশ্বাসী এই জন্য শ্রীশচন্দ্র যখন নিজের বাটী প্রস্তুত করিলেন ভূপালসিংকে বাটীর জমাদার করিয়া দিলেন। ভূপালসিং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাহিলে শ্রীশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "জমাদার তোমার মাজী এখানে থাকেন, সেই জন্য তাঁহাকে তোমার জিম্মায় রাখিতে পারিলে আমি

নিশ্চিন্ত হইয়া বাহিরে বেড়াইতে পারি।" ভূপালসিং সেই হইতে কণিকার রক্ষক স্বরূপ বাটীতেই থাকিত।

প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তর জমাদার সাহেব খাটিয়ার উপর বসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য থালায় করিয়া অরহর দাইল গণনা করিতেছিলেন, এমন সময় দাসী আসিয়া বলিল "জমাদার বাবু, মা ডাকছেন।"

চমকিত হইয়া ভূপালসিং ফিরিয়া চাহিতেই অভিমানে দাইলের থালা ভূতলে পড়িয়া হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল, জমাদার কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। জমাদার সাহেব আজ আট বৎসর শ্রীশচন্দ্র নিকট আছেন কিন্তু ইহার মধ্যে মাজী ত কোন দিনই তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই; হঠাৎ এ নূতন কথা শুনিয়া তিনি ঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মা জী তাঁহাকে কেন ডাকবেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেয়া বোলা?"

"মা জী এই তোমারে বোলাতা, বুঝলে হাঁদারাম সাহেব; ডালগুলো অমন করে ফেলে দিলে কেন?" জমাদার সাহেব দাসীর উক্তির হাঁদারাম কথার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও বাকি কথা বুঝিয়াছিলেন সুতরাং তিনি বলিলেন, "আরে জানে দেও, গির গিয়া ত গিয়া, উসমে কুচ হরজা নেহি হ্যায়, লেকেন মাজী হামকো কাহে বোলায়া, হামরা ত কুছ সমজ নেহি হোতা হ্যায়।"

দাসী বলিল "সেখানে দাদা মশায় আছেন, তোমাকে সমজ

করিয়ে দেবেন, আমিও তোমাকে সমজ করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তুমি যে আমার কথা বুঝতে পারতা নেই।”

জমা—হাঁ তা তুমি বোল—আমি সমজ লেগা।

বাটীর কোন গুপ্ত রহস্যই দাসী চাকর দিগের অগোচর থাকে না; তাহারা কেমন করিয়া সব কথাই জানিতে পারে। যদি কেহ দাসী চাকরকে লুকাইয়া বাটীতে কোন গুপ্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, সে কার্য্য কখনই অপ্রকাশ থাকিবে না। সুতরাং শ্রীশচন্দ্র প্রেরিত পত্রের কথা যে দাসী জানিতে পারিবে ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের নাই। জমাদারের কথা শুনিয়া দাসী বলিল “কথাটা কি জান, ঐযে রামেশ্বর বাবু আমাদের এখানে থাকেন সেই তিনি বাবুর কাছে মায়ের সঙ্গে মেসো মশায়ের নামে বুঝলে কিনা—লিখেছে।

ভূপা।—রাম কহ! শালা এয়সা বেইমান হ্যায়, আনে দেও বহিন—কো হাম জুতি মারকে হিঁয়াসে নিকাল দেগা।

দাসী সভয়ে কহিল—চুপ, চুপ খবরদার জমাদার সাহেব আমার কাছে একথা শুনেছ কেউ যেন জানতে না পারতা।

ভূপা।—ঘবড়াও মৎ, সব হাল হামারা মালুম হোগিয়া। বাবু কেয়া মুফৎ হামকা ত্রিশ রোপেয়া কর্কে তলব দেতা হ্যায়? ওসিকা ওয়াস্তে বাবু কাল নেহি ঘরমে আয়া। শালা বাঙ্গালী এ্যায়সা বেইমান হ্যায়, তোম চলো হাম যাতা হ্যায়।

দাসী চলিয়া গেল; ভূপালসিং তখন “হরি সিং” বলিয়া ডাকিতে হরি সিং, আসিয়া জমাদারে সম্মুখে দাঁড়াইল। জমাদার

বলিল, "হিঁয়া খাড়া রহো, রামেশ্বর বাবু আয়েগা ত ভিতর আনে মাত দেও।"

"যো হুকুম" বলিয়া হরি সিং বুক ফুলাইয়া দেউড়িতে দাঁড়াইয়া রহিল। ভূপাল সিং ভিতরে চলিয়া গেল। সিঁড়ির নিম্নে জুতা খুলিয়া রাখিয়া জমাদার উপরে উঠিয়া "সেলাম মা জী" বলিয়া হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইতে কণিকা মৃদুস্বরে বলিল "বাবা, জমাদার কে বলুন, রামেশ্বর বাবুকে আমার বাটী থেকে যেতে বলেন।" "যো হুকুম মা জী" বলিয়া জমাদার দুই হস্তে সেলাম করিয়া তিন লম্ফে নিম্নে আসিয়া দেউড়ীর দিকে দ্রুত পদে অগ্রসর হইল।

ইত্যবসরে রামেশ্বর বাবু আসিয়া দেউড়িতে প্রবেশ করিতেই হরি সিং আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল—"খাড়া রহো, ভিতর যানেকা হুকুম নেহি হ্যায়।"

রামেশ্বর প্রথমতঃ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—তিনি, শ্রীশচন্দ্রের বাটীতে এতদিন বাবুর মত সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন, শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধেই তিনি তাঁহার বাটীতে বাস করিতেছেন—একটা সামান্য দশটাকা মাহিয়ানার মেড়ুয়া দরোওয়ান কি না তাঁহার,—শ্রীশচন্দ্রের বন্ধুর. স্বয়ং রামেশ্বর শর্ম্মার প্রতি এইরূপ আচরণ করিতে সাহস করিয়াছে! তিনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন "কেয়াবোল্‌তা ?" হরিসিং ব্যঙ্গস্বরে বলিল "সমজাতে নেহি, তোমারা ভিতর যানেকা হুকুম নেহি হ্যায়, বাহার যাও।" রামেশ্বর উগ্রকণ্ঠে বলিলেন

"কিসকা কোন হুকুম দিয়েছে?" "জমাদার সাহেব কা হুকুম" বলিয়া হরিসিং সগর্ব্বে রামেশ্বর বাবুর সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল। জমাদারও সেই সময়ে দেউড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। জমাদারকে দেখিয়া রামেশ্বর বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "কি গো জমাদার সাহেব, এরকম হুকুম চালাতে আবার কবে থেকে সুরু করেছ? তোমার লেজুড় বলে ভিতরে যাবার হুকুম নেই, ব্যাপার কি, একেবারে হাতীর পাঁচ পা দেখেছ নাকি? বাঙ্গালার জল লেগে যে বড় তিলিয়ে উঠেছ দেখতে পাই!" রামেশ্বর বাবুর কথা শুনিয়া ভুপালসিং বলিল, "যাস্তি বাৎ মাৎ বোলো রাম বাবু, হিয়াঁ আউর তোমরা রহেনেকা হুকুন নেহি হ্যায়, তোমরা চিজ বাজ লেকে আভি চলা যাও।" রামেশ্বর উচ্চকণ্ঠে বলিলেন "তোর হুকুমে যাব নাকি, আমাকে বাড়ীতে যে রেখেছে সে যখন বল্‌বে যাব, তুই বেটা মেড়ো, হুকুম চালাবার কে?" রামেশ্বরের মুখ হইতে সমস্ত কথা বাহির হইতে না হইতে হরিসিংহের এগার ইঞ্চি পরিমাণ লৌহ-কোমল হাতখানি আসিয়া রামেশ্বর বাবুর মুখের উপর পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হরিসিং বলিল "সমঝ কর্‌কে বাত কহো ভেড়ুয়া বাবু।" রামেশ্বরের ওষ্ঠ বহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ভুপালসিং বলিল, "রামবাবু, গোলমাল মাৎ করো, তোমারা চিজবাজ লে জানে মাঙ্গো লে যাও, নেহি মাঙ্গ তো চলা যাও, লেকেন সমঝ লিজিয়ে, পিছাড়ি কোহি রোজ তোমকো এ রাস্তামে দেখেঙ্গে তো তোমরা হাড্ডি তোড় দেঙ্গে। হরিসিং! দেখো রামবাবু চিজবাজ লেযানে মাংতা তো সাথমে লে যাও,

দশমিনিটকা যাস্তি দের মাৎ করো।"—বলিয়া ভূপালসিং দেউড়ীর উপর উঠিয়া খাটিয়ার উপরে শয়ন করিলেন. হরিসিং রামেশ্বরকে বলিল, "চিজ লেওগেতো চলো, নেহি লেওগেতো বাহার যাও।"

রামেশ্বর বাবু দরোওয়ান দিগের নিকট এইরূপ অপ্রত্যাশিত লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলেন, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনই তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিত না, তবে কি শ্রীশবাবুই তাহার পত্র পাইয়া এইরূপ আজ্ঞা দিয়া পাঠাইয়াছেন? তাহাই সম্ভব। তিনি ভাবিলেন, কি করিতে কি হইল, কুবুদ্ধি করিয়া শেষে আশ্রয়টুকুও হারাইলাম—কিন্তু আর চিন্তার সময় নাই, তাঁহাকে যাইতেই হইবে, কিন্তু তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইবেন, সুতরাং তিনি হরিসিংকে বলিলেন "চল আমার জিনিস পত্র নিয়ে যাব।"

রামেশ্বরের যথাসর্ব্বস্ব একটি টিনের বাক্স। সেই বাক্সের মধ্যেই তাহার সমস্ত সংসার, জুতা হইতে টুপি পর্য্যন্ত যাবতীয় পোষাক এবং টিকা হইতে বোতল পর্য্যন্ত নেশার সরঞ্জাম, আহার্য্য দ্রব্য ও মুড়ি হইতে মোণ্ডা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যায়। সে বাক্সের মায়া রামেশ্বর কিরূপে পরিত্যাগ করেন? মুটে ডাকিবার অবসর নাই, বাক্সের মায়াও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি হরিসিংহের সহিত নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া টানাটানি করিয়া বাক্সটি মাথায় তুলিবার কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করিতে হারসিং বাক্সটি ধরিয়া তাঁহার মস্তকে তুলিয়া দিল। রামেশ্বর বাবু মাথার দিকে একটু অধিক দীর্ঘ ছিলেন, বাক্সটিও গুরুভার

বিশিষ্ট, সুতরাং তিনি মৃদু মন্থর গতিতে দ্বারের নিকট আসিয়া, বাক্স এবং পদ এক সঙ্গে সামলাইতে পারিলেন না, চৌকাট বাধিয়া পতিত হইলেন। পলাসীর যুদ্ধে ক্লাইভের তোপধ্বনি পরাজিত ভীম শব্দে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব ভূতলে পতিত হইয়া ক্রোধে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক অভ্যন্তরস্থ সমস্ত পদার্থ উদ্গীরণ করিয়া, বারাণ্ডা, সিঁড়ি এবং প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে হরিসিংহ বলিয়া উঠিল, "আরে কেয়া কিয়া, ঘরবাড়ী সব একদম খারাব কর দিয়া, উঠ—জলদি কর, সব চিজ উঠায়কে তোমরা ডিবিয়ামে ভর্ত্তি করকে লে যাও।"

বাক্স পতনের শব্দে জমাদার সাহেব দেউড়ি হইতে দৌড়িয়া আসিলেন। তখন রামেশ্বর উঠিয়া, কাপড় জামা, জুতা, হুঁকা, কলিকা, তামাক, টিকে, বোতল ভাঙ্গা, মুড়ি, সন্দেশ আকের টিকলি প্রভৃতি কুড়াইয়া, পুনরায় বাক্সের মধ্যে তুলিতেছিলেন; সমস্ত দ্রব্যই বাক্সের ভিতর উঠিল, কিন্তু অভিনব বংশ নলবিশিষ্ট একটি মাটীর গুড়গুড়ির পুনরায় আর বাক্সের মধ্যে স্থান হইল না। অগত্যা রামেশ্বর বাবু সেইটি হস্তে লইয়া মূর্ত্তিমান ব্যোমের মত মাথায় মোট এবং হস্তে ম্যাক লইয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। জমাদার তাহার সেই ম্যাকটীকে বুঝিতে না পারিয়া হরিসিংকে জিজ্ঞাসা করিতে হরিসিং বলিল "গোলিকা এঞ্জিন হায়, শালা গোলি খাতাথা—আফিম পুড়ায়কে উস্কা ধোঁ খাতা।" ঘৃণার স্বরে জমাদার বলিল "ওসি কা ওয়াস্তে—শালাকো এইসা শলা থা।"

রামেশ্বর বাবু রাস্তায় আসিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তিনি নিকটে একটিও মুটিয়া দেখিতে পাইলেন না, বড়রাস্তার মাঝখানে বড়লোক-পাড়ায় রাস্তায় বাহির হইয়াই মুটিয়া পাওয়া যায় না, অগত্যা তাঁহাকে বাক্স মাথায় করিয়া মোড় পর্য্যন্ত যাইতে হইল; কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঘাটীর পাহারা-ওয়ালার, মেরু হস্তে বাক্স মাথায়, আবার ভদ্রলোকের মত, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া সন্দেহ হইল, সে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে সেই অদ্ভুত লোকটির নিকটে আসিয়া বলিল, "আরে কাঁহা যাতাহো?"

রামেশ্বর বাবু কোথায় যাইবেন জানিতেন না, সুতরাং বলিলেন, "আমি মুটে খুঁজছি।" বাক্স মাথায় করে নিয়ে রাস্তায় মুটে খুঁজতে বেরিয়েছে এ কিরূপ ভদ্রলোক? পাহারা-ওয়ালার সন্দেহ হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল "আরে কাঁহা যাওগে?" রামেশ্বর উত্তর করিলেন "বাসা দেখে নিতে যাচ্চি।" পাহারা-ওয়ালা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল 'কাঁহাসে আতাহো?"

এইবার রামেশ্বরের ক্রোধ হইল। তিনি রামেশ্বর বাবু আর এ বেটা একজন সামান্য চৌকিদার, তাহার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে তিনি কখনই বাধ্য নহেন। সুতরাং তিনি রুক্ষ স্বরে বলিলেন "তোমার অত নিকেশের দরকার কি?"

"ওহি নিকাস কা ওয়াস্তে কোম্পানী বাহাদুর ত হাম লোককে তলব দেতা হায়, তোমারা মাফিক হাম বহুত চোট্টা পাকড়ায়া—চল্ থানায় চল্।"

"থাম, থাম, মুটে করি, তার পর থানায় যেতে হয় পুলিস কোর্টে যেতে হয় যাব, ধর বাক্সটা নামিয়ে দাও, মুটে ডাকি।" এই বলিয়া রামেশ্বর বাবু পাহারাওয়ালার নিকট অগ্রসর হইতে সে তাহার পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "হাঁ হাঁ শালা তোম বড় সেয়ানা আছে, ভাগ্‌নে মাংতা, তোম শালা দাগী হ্যায়, চলো বাক্স মাথা পর লেকে থানামে চলো।—" বলিয়া পাহারাওয়ালাজী কোমর পেটি হইতে রুল খুলিতেই রামেশ্বর বাবু গুটি গুটি থানায় গমন করিলেন।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কন্যাকে আশ্বাস দিয়া শশিশেখর সেই দিনই বোম্বে মেলে চাকিয়া যাত্রা করিলেন। কণিকা কিন্তু পিতার আশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না; তাঁহার অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিতে লাগিল, তিনি সেখানে নাই, তিনি চলিয়া গিয়াছেন, বাবা ফিরিয়া আসিবেন—তাঁহার মনে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে,—তিনি সেখানে নাই; তাহার মনে হইতে লাগিল চতুর্দ্দিক হইতে কত অশরীরিরা যেন তাহার কাণে কাণে অশ্রুত ভাষায় তাহাকে বলিতেছে,—তিনি সেখানে নাই—কণিকা হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তিনি সেখানে নাই, বাবা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন না, তাঁহার সরল প্রাণে, এ তীব্র গরলের ভীষণ জ্বালা সহ্য হইবে না, অসহ্য যন্ত্রণা তিনি কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ হয় ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল, এ যন্ত্রণার তুলনা নাই এ যন্ত্রণার বিরাম নাই,এ যন্ত্রণায় শান্তি নাই। কি করিব? স্বামি! প্রভু! আমার যন্ত্রণা অপেক্ষা তোমার যন্ত্রণার জন্য আমি যে অধিক ব্যাকুলা! কোথায় তুমি? এস—এস দেখে যাও, তোমার কণিকা অবিশ্বাসিনী নয়, তোমার কণিকা যে তোমার চরণ ভিন্ন আর কিছুই জানে না, কোন্ প্রাণে তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, কি পাপে তাহাকে এই কঠিন শাস্তি দিলে! আমার কেমন ভয় হইতেছে, বিমলা দিদিকে ডাকিয়া পাঠাই—একেলা থাকিবে পারিব না।

কণিকা বিমলাকে আনিবার জন্য গাড়ি পাঠাইল। বিমলাকে পত্র লিখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু সে কিছুই লিখিতে পারিল না। অনেক কষ্টে কণিকা লিখিল "দিদি, একবার এস। আমি বড় বিপন্না। তোমার স্নেহের হতভাগিনী—কণিকা।" দাসী কণিকার পত্র এবং গাড়ী লইয়া বিমলাকে আনিতে গেল।

কণিকার সেই অস্পষ্ট পত্র পাঠ করিয়া বিমলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ দাসীর সহিত আসিয়া গাড়ীতে উঠিল, সংবাদ জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত উৎসুক হইলেও বিমলা দাসীর নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

বিমলাকে দেখিয়া কণিকা বলিল—"দিদি এসেছ, এস—এইখানে আমার কাছে এস।" কণিকার মূর্ত্তি দেখিয়া বিমলা বুঝিল, নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়াছে, নচেৎ এ ফুল্লকমল এরূপ বিষাদের প্রতিমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইবে কেন! বিমলা কণিকার পার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "কি হয়েছে দিদি?"

"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!" হতাশের হৃদয়ভেদী হাহাকার যেন বাক্যরূপে কণিকার মুখ হইতে নির্গত হইল। সে "এই দেখ" বলিয়া শ্রীশচন্দ্রের পত্রখানি বিমলার হস্তে প্রদান করিল। পত্র পাঠ করিয়া বিমলা স্তম্ভিত হইল; কিন্তু সে সবিশেষ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বিনা মেঘে এ বজ্রাঘাতের কারণ?"

অবিচলিত গম্ভীর স্বরে কণিকা উত্তর করিল "কারণ দেখাইতে পারিলাম না, বাবা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, সে

আর একখানি পত্র, তাহার মর্ম্ম মোহিতের সহিত আমার দুর্নাম রটনা হইতেছে, কাণাঘুসা চলিতেছে, শীঘ্রই সকলে জানিবে।"

চমকিত হইয়া বিমলা বলিল "সর্ব্বনাশ! সে পত্র কোথা হইতে আসিল?"

আমার পত্রের সঙ্গে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তোমার মত আমিও প্রথমে পত্র পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই, পড়িতে পড়িতে আমি মাথা ঘুরিয়া খাটের উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম।"

বি। তার সাক্ষী কপালের পটী দেখতে পাচ্চি।

ক।—জ্ঞান হইলে পত্রখানি তিন চারি বার পাঠ করিয়াও ভাল বুঝিতে পারি নাই। তাহার পরে আমার স্মরণ হইল, এই পত্রের সঙ্গে আর একখানি পত্র ছিল; সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া বুঝিলাম আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আমার সকল সুখের শেষ হইয়াছে।

নীরস সীসার অক্ষরের মত কথাগুলি কণিকার মুখ হইতে নির্গত হইল।

কণিকার কথা শুনিয়া আর্ত্তস্বরে বিমলা কহিল "হতভাগী একটু চোখের জল ফেল, সব যে পুড়ে গেল।" কণিকা যন্ত্রের মত বলিল—

"ঝরণা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে দিদি, জল কোথা পাব? এ মরুভূমিতে জল নাই—আকাশে মেঘ পর্য্যন্ত নাই। দিগদিগন্ত-

ব্যাপী সুনীল আকাশতলে শুধু শুভ্র উত্তপ্ত কোমলতা-হীন নীরস বালুকা রাশি ধূধূ করিতেছে, নিশ্বাসে প্রলয়ের কাল বায়ু অবিরাম বহিতেছে, কি হবে দিদি ?"

বিমলা কণিকাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে খুঁজিয়া পাইল না। সে দুই হস্তে কণিকাকে বেষ্টন করিয়া তাহার মুখখানি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কণিকা বলিল, "দিদি, কি পাপে আমার এই শাস্তি হইল ? তুমিও আমার মত হতভাগিনী, তবে তুমি কখন পাও নি, আমি পেয়ে হারাইয়াছি এই তফাৎ।" বিমলা বলিল—"বাবা ত চাকিয়ায় গিয়াছেন, তিনি শ্রীশবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।"

"তিনি সেখানে নাই, বাবা তাঁহার দেখা পাইবেন না।"

"তুই কি করে জানলি যে তিনি সেখানে নাই ?"

কণিকা তাহার বক্ষস্থলে হাত দিয়া দেখাইয়া দিল। বিমলা শ্রীশচন্দ্রের পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিয়া বলিল "আচ্ছা এই যে কিছুদিন পূর্ব্বে সন্দেহ হইয়াছিল—লিখিয়াছে, সেটা কি তুই জানিস্ ?" মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কণিকা বলিল "তিন বৎসর পূর্ব্বে মাধুরীর বিবাহের পরে আমরা একদিন আমাদের খিড়কির পুকুরের ঘাটে ডুব সাঁতার খেলিয়াছিলাম, আমাকে মোহিতের সহিত জলে খেলা করিতে শুনিয়া বাবা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন, সেই কথা বিধু পিসি ওঁকে বলে, তাহাতে আমাকে বলিয়াছিলেন 'কণা তুমি আর এখন বালিকা নও সমস্তই বুঝিতে পার, লোকে তিলে তাল করিয়া থাকে,

তোমার সম্বন্ধে এরূপ কথা শুনিলে আমার মনে কষ্ট হয়।" সেই হইতে আমি মোহিতের সহিত খেলা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

বি।—আচ্ছা মোহিত যে, এখানে থেকে পড়বে সে কি শ্রীশবাবু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন?

ক।—না, মোহিত এনট্রেন্স পাশ করিয়া এখানে মেসে থাকিয়া পড়িত। সে একদিন আমাকে বলিল "দিদি মেসে থাকৃতে বড় কষ্ট হয়, তোমার বাড়ীতে ত অনেক জায়গা পড়ে আছে, দাদাকে বলিয়া যদি আমাকে এখানে থাকিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দাও বড় ভাল হয়।

বি।—মোহিত নিজে বলেনি কেন?

ক।—আমি বল্‌তে বলেছিলাম, তাহাতে মোহিত বল্লে, দাদাকে বল্‌তে আমার লজ্জা করে, তাই আমিই তাঁকে বলি।

বি।—মোহিত তোর ভগ্নিপতি, আবার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে দেওর, মোহিতের সঙ্গে তোর হাসি তামাসা খুব চলে, কেমন?

ক।—হ্যাঁ তাতে কি কোন দোষ হয়েছে?

বি।—খুব হয়েছে, ওদের মন বড় অবিশ্বাসী, আমরা যদি কারুর সঙ্গে হেসে কথা কই, অমনি ওরা সন্দিগ্ধচিত্ত হয়, আমাদের অনেক ভেবে চিন্তে সংসারে চলতে হয় দিদি।

ক।—তাতে যদি দোষ হয়ে থাকে দিদি, আমি দোষী। মোহিতকে যে আমি অখিলের মত ছোট ভাই মনে করি। দিদি, অখিলের সঙ্গে আমি যেরূপ অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কই, মোহিতের

সহিতও আমি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করি, মোহিতকে যে আমি অখিলের মত আমার মায়ের পেটের ভাই মনে করি।

বি।—তুমি মনে করতে পার কিন্তু সকলের মন ত সমান নয়।

ক।—তাঁর মনও সকলের মনের মত নয়; কিন্তু তাহলে কি দিদি, মোহিতের সঙ্গে আমার এই নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারই তাঁর সন্দেহের কারণ?

বি।—অন্য কোন কারণ ত আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

ক।—তিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই কেন?

বি।—তোমাকে সে কথা বলিতে বোধ হয় লজ্জা হইয়াছিল, তুমি কি মনে করিবে? তুমি তাঁহাকে সন্দিগ্ধচিত্ত মনে করিবে, তাহাতে তাঁহার আত্ম-সম্ভ্রমের হানি হইবে, এই ভয়ে বোধ হয় তোমাকে বলেন নাই। স্ত্রীর নিকট ওদের আত্মসম্ভ্রমটি বড়ই মূল্যবান্; এই সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যাইয়া যে সংসারে কত সর্ব্বনাশ হয় তাহার নির্ণয় নাই। ওরা যতই ভাল বাসুক না কেন, ওদের মন হইতে কথন পর পর ভাব দূর হয় না; আমাদের মত ওরা আত্মবলি দিতে পারে না, আত্মবলি দিতে জানে না, এই আত্ম-বলি দিতে পারাই আমাদের সুখ; তারপর ওরা সন্দিগ্ধমনা, সন্দেহের আগুন ওদের হৃদয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে, ওরা কিন্তু তাহা জানিতে পারে না। কোন প্রকারে একটু অনুকূল বায়ুর সাহায্য পাইলে সে অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সে আগুনে নিজেরা দগ্ধ হয় আমাদিগকেও দগ্ধ করে।

ক।—আমার মনে কোন পাপ নাই দিদি, আমার দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়া না জানি তাঁহার মনে কত কষ্ট হইতেছে।

বি।—মিথ্যা সন্দেহকে হৃদয়ে স্থান দিলে তাহার দংশনের তীব্র বিষে ত জর্জ্জরিত হইতেই হইবে।

ক।—কি হবে দিদি?

বি।—ভগবানকে ডাক বোন্, তিনিই উপায় করিয়া দিবেন।

ক।—আমার ভগবান যে তিনি দিদি, ভগবানকে ডাকতে যে আমি তাঁকে ডেকে বসি।

বি।—তুমি সাধ্বী, তোমারই স্ত্রীজন্ম সার্থক, তোমার পতি-ভক্তির তুলনা নাই, এই পুণ্যেই তুমি আবার তোমার হারানিধি ফিরে পাবে।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া কণিকা ডাকিল "দিদি!"

বি।—কি বোন!

ক।—তোমার কি মনে হয় দিদি? বাবা কি দেখা পাবেন? তিনি কি আসবেন?

বি।—তোমার মন কি বলে?

ক।—সে ত তোমায় বলেছি আমার মন সর্ব্বদাই হাহাকার করিয়া বলিতেছে তিনি সেখানে নাই।

বি।—বুক বাঁধ বোন, সহ্য করিবার জন্যই রমণীর সৃষ্টি।

ক।—তুমি এখন দুদিন যেওনা দিদি, আমার কাছে থাক, একলা থাকিতে আমার ভয় হয়।

বি।—বাবা না ফিরিয়া আসিলে আমি বাটী যাইব না।

একদিন দুইদিন করিয়া আটদিন কাটিয়া গেল, নবম দিবসে শশিশেখর ফিরিয়া আসিলেন; শ্রীশচন্দ্রের সন্ধানে তিনি বোম্বে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীশচন্দ্র বিলাসপুর হইতে ট্রেণে উঠিয়াছেন, তাহার পর হইতেই তিনি নিরুদ্দেশ। ইতিমধ্যে সাহপুর হইতে কণিকার মাতা মাধুরী, ও অখিলকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই গুরু চিন্তা ভার প্রপীড়িত। অখিলচন্দ্র বাটী হইতে বড় আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, শ্রীশ দাদার নিকট হইতে একটী ভাল বিলাতি কুকুর লইয়া যাইবেন, সুতরাং অখিলচন্দ্রও ভগ্নীপতির ভাবনায় না হউক, কুকুর প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীশচন্দ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। শৈশবেই তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল; মাতার মৃত্যুর পরে তাঁহার পিতাও একপ্রকার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মাতৃস্নেহ কি তাহা জানিতেন না, কখন কাহারও নিকট মিষ্ট কথা পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই, ছেলেবেলা ক্ষুধা পাইয়াছে বলিলে, শ্রীশচন্দ্রের জ্যেঠাই মা দুর্গামণি ঠাকরুণ ঝঙ্কার দিয়া বলিতেন "মাগো! মা-খেগো ছেলের খেয়ে আর আছিক্কে মেটে না।" অথচ শ্রীশচন্দ্র দেখিতে পাইতেন জ্যেঠাইমা তাঁহাকে লুকাইয়া নিজের পুত্রদিগকে খাবার দিতেছেন, ইহাতে তিনি দুঃখিত হইতেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি যে মাতৃহীন বলিয়া তাঁহার একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পতিত হইত না এ কথা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবে না। যাহা হউক অল্পদিন পরে ভগবান তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন; তাঁহার মাতুল শশধর বাবু একবার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া, লোক পরম্পরায় তাঁহার প্রতি অযত্নের কথা শুনিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্রের মাতুলানী যোগেশ্বরী দেবী আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তিনি শ্রীশচন্দ্রকে পুত্রদিগের অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। শ্রীচন্দ্রের বিশ্বাস হইয়াছিল, আপনার মাতা অপেক্ষা অপর কেহই অপরকে যত্ন করে না, কিংবা ভাল বাসে

না কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মামীমা তাঁহাকে নিজ পুত্রদিগের অপেক্ষাও অধিক যত্ন করেন, সর্ব্ববিষয়ে শ্রীশচন্দ্রের প্রতি মাতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া পুত্রেরা শ্রীশচন্দ্রের হিংসা করিত, যোগেশ্বরী তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন "আহা ওর মা নেই, ওকে দেখবার কি যত্ন করবার কেউ নেই, তোরা ওর হিংসে করিস কেন?" শ্রীশচন্দ্র ভাবিত আমার জ্যেঠাই মাও মানুষ, মামী মাও মানুষ, মামীমার মত মানুষ এ জগতে আর কেউ আছে? আছে, শ্রীশচন্দ্র, আছে—নচেৎ সংসার চলিত না, তবে জগতের বা জগৎবাসীর দুর্ভাগ্য অধিকাংশই তোমার জ্যেঠাইমার মত মানুষ!

কলিকাতায় আগমনের কয়েক বৎসর পরে শ্রীশচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা বৃত্তি পাইলেন, শশধর বাবু তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কলেজের মাহিয়ানা বাদে তিনি প্রতি মাসে যে পাঁচ টাকা ফেরৎ পাইতেন, তাহা বাটিতে আনিয়া প্রতি মাসেই মামীমার হস্তে প্রদান করিতেন। ফার্ষ্ট আর্টসেও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বি এ, পরীক্ষা দিবার পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। এম এ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে তাঁহার মামীমা, কার্ত্তিক মাসে শ্রীশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সাহপুরে একবার তাঁহার পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা শশিশেখর বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কণিকার সহিত তিনি মনে মনে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এবং কণিকাকে দেখাইবার জন্য শ্রীশচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কণিকার বয়স সে

সময়ে একাদশ বৎসর। কণিকাকে শ্রীশচন্দ্রের বড় ভাল লাগিল। সাহপুরে আসিবার দুই তিন দিন পরে মামীমা শ্রীশ-চন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা শ্রীশ, আমার একটি কথা রাখতে হবে।" শ্রীশচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিল—

"আপনার কথা রাখতে হবে বলে আমাকে অনুরোধ কচ্চেন দেখিয়া আমি মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব কচ্চি, আপনি আজ্ঞা করিলেই আমি পালন করিতাম।"

"তুমি আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করবে তা আমি জানি, কিন্তু বাবা এ চির জীবনের খেলা, এখন তুমি বড় হয়েছ, যদি ছেলে বেলা হতো, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতাম না, সম্বন্ধ স্থির করে একেবারে বিয়ে দিতাম, কিন্তু এখন তোমার মত না নিয়ে সে কাজ করা উচিত নয়; আমার ইচ্ছা আমার ভাইঝির সঙ্গে তোর বিয়ে দি, কণিকে তোর পছন্দ হয়?"

শ্রীশচন্দ্র এতক্ষণে বুঝিলেন, মামীমার এ শুধু শুধু তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে আসা নয়, তিনি তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে কনে দেখাইতে আনিয়াছেন। মামীমার তাঁহার প্রতি বড় স্নেহ চিন্তা করিয়া শ্রীশচন্দ্রের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল—কিন্তু শ্রীশচন্দ্র পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এরূপ স্থলে তাঁহারা কি উত্তর দিতেন? কণিকাকে তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, এবং তাঁহার যে কণিকাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হয় নাই, একথা আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি না। শ্রীশচন্দ্র কিন্তু মামীমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

যাহা হউক কণিকার সহিত শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ স্থির হইল, শুধু স্থির নয়, অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর শ্রীশচন্দ্র এম-এ পাশ করিলেন। তাহার পরের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশচন্দ্র চাকিয়ায় আসিয়া দেখিলেন তাঁহার ইঞ্জিনীয়ার রামদাস বাবু নূতন খনির কার্য্যারাম্ভের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া একটি ভাল দিনের অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীশচন্দ্রকে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, কাল দিন ভাল আছে, আমরা কল্যাই কার্য্য আরম্ভ করিব।" পর দিবস কার্য্যারম্ভ হইল। তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিবেন না, সাবিত্রীব্রত নিকট, তাহার দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হইবে। রামদাস বাবু (ore) মিশ্র খনিজ পদার্থ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি শুনিলেন শ্রীশচন্দ্র আজ ফিরিয়া যাইবেন। তিনি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি দুইদিন থাকিয়া গেলে আমি আপনাকে ওর (ore) সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ দিতে পারিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী যাইতে পারিবেন।" শ্রীশচন্দ্র সম্মত হইলেন এবং কণিকাকে দুই দিন পরে ফিরিবেন লিখিয়া পাঠাইলেন।

প্রতিশ্রুতি মত রামদাস বাবু তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন কালে শ্রীশ-চন্দ্রকে ওর (ore) বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন; তাহাতে পৃথক পৃথক দুইটি ধাতু আছে, তাহার একটি বিশেষ মূল্যবান, তাহাকে দুর্মূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং তাহারই পরিমাণ অধিক।

তাঁহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত দেখাইয়া দিয়া অবশেষে রামদাস বাবু বলিলেন, "আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। এরূপ ভাগ্য সচরাচর কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না, আমার স্থির বিশ্বাস এ খনি আপনাকে কোটীপতি করিবে; আমার অনুমান বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের বিশলক্ষ টাকা লাভ হইবে।" রামদাস বাবুর কার্য্যদক্ষতায় শ্রীশচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন বিশেষজ্ঞ; রামদাস বাবুর সহিত তাঁহার অভিমত মিলিয়া গেল। তিনি রামদাস বাবুকে বলিলেন "রামদাস বাবু আপনিও আমার সেই সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে এই খনির লভ্যের দুই আনা অংশ পারিতোষিক স্বরূপ প্রতি বৎসর প্রাপ্ত হইবেন। আমি কলিকাতায় যাইয়া আপনাকে অংশপত্র রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিব।" শুনা যায় শ্রীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া রামদাস বাবু অবাক হইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়াছিলেন।

আজ শ্রীশচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন; চাকিয়া হইতে বিলাসপুর প্রায় আঠারো মাইল পথ, ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইবে। শ্রীশচন্দ্র বেলা দুইটার সময় যাত্রা করিবেন, পূর্ব্বদিনই তাহার বন্দোবস্ত হইয়া আছে। বেলা আটটার সময় শ্রীশচন্দ্র রামেশ্বর বাবুর পত্র প্রাপ্ত হইলেন; পত্র পাঠ করিয়া শ্রীশচন্দ্র জড়ের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার চিন্তা শক্তি পর্য্যন্ত লোপ হইল; তিনি জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই পত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইল, অমনি শত বৃশ্চিক এককালে তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিল।

বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পত্র-খানি পুনরায় পাঠ করিয়া পত্র হস্তে অস্থির ভাবে গৃহের মধ্যে পাদ-চারণা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার মন কথঞ্চিৎ স্থির হইলে পত্র খানি আর একবার পাঠ করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং টেবিলের উপর মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন, পরে মস্তক তুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলেন—মন কখন মিথ্যা সন্দেহ করে না, কণিকা তাঁহার আদরের কণিকা, তাঁহার হৃদয়ের হার, অন্তরের সুখ, সুখের শান্তি, সংসারের বন্ধন, নয়নের আনন্দ, জীবনের সঙ্গিনী তাঁহার সেই কণিকা, উঃ বড় জ্বালা, ভালবাসা বড় জ্বালা! একি সত্য? না—না বোধ হয় মিথ্যা! না না সত্য—সত্য! এ মিথ্যা নয়! তাঁহার মন যে পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিল। তাহার হাসি দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছিল—সে প্রেমের হাসি—তিনি বুঝিতে পারেন নাই, মনকে দমন করিয়াছিলেন কিন্তু মনের সন্দেহ একে-বারে দূর করিতে পারেন নাই, কথায় বা কার্য্যে কিছুই প্রকাশ করিতেন না বটে কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেন—মনের সন্দেহ কখন অমূলক নহে—এ বিশ্বাস উপস্থিত হইলে মন হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতেম। ছি ছি! লোকে ভালবাসে কেন? স্ত্রীলোক এত হীনা, তিনিই বা কি! তিনি ত এখনো তাহাকে ভুলিতে পারিতেছেন না। তাহার প্রতি এখনও তাঁহার ক্রোধ হই-তেছে না! ধিক তাঁহাকে!

শ্রীশচন্দ্র পুনরায় অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে বারটা বাজিল। শ্রীশচন্দ্র অন্যমনে ঘণ্টা-ধ্বনি গণনা করিতে লাগিলেন বারটা বাজিল, কাল যেমন বাজিয়াছিল আজও সেইরূপ বাজিল, কাল যেমন সূর্য্য উঠিয়াছিল আজও সেইরূপ উঠিয়াছে, সেই বৃক্ষ, সেই লতা, সেই গৃহ, সেই পথ, সবই কাল যেমন ছিল আজও ঠিক সেইরূপ আছে, কোন পরিবর্ত্তন নাই; আমিও সেই, কিন্তু সে আমি আর এ আমিতে কত বিভিন্নতা! আমার সেই প্রকৃত আমির চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে, এ আমি তাহার প্রেতমূর্ত্তি। সুন্দর এমন কুৎসিত কেন? জগৎ সুন্দর, প্রকৃতি সুন্দর, প্রকৃতির কার্য্য সুন্দর, রমণী সুন্দর, কিন্তু সেই সুন্দরের অন্তর কি কুৎসিত! কি করিব? কি করিবার আছে? কিছুই নাই! শুনিয়াছি লোকে ক্রোধে উন্মত্ত হয়, আমার কি ক্রোধ হইয়াছে? এর নাম কি ক্রোধ? না—না ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে লোকে যে নরহত্যায়ও কুণ্ঠিত হয় না! আমার এ ক্রোধ নয়; তবে কি? ইহার নাম নাই, সীমাবদ্ধ অথবা নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের নাম হয় ইহার নির্দ্দেশ নাই, সীমা নাই, সুতরাং নামও নাই; কিন্তু ইহা অতি ভয়ঙ্কর, অতি দুর্ব্বহ; আমি—এই সময়ে শ্রীশচন্দ্রের ভৃত্য হটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ডাকিল "হুজুর!" চমকিত হইয়া শ্রীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্যা মাঙ্তা?" হটিয়া বলিল "বামহন ঠাকুর বোলছেন ভাত হয়ে না গেছে, যদি আপনি চান করেন।" শ্রীশচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা পানি উঠাও।" হটিয়া চলিয়া গেল, শ্রীশচন্দ্র ভাবিলেন বাটী যাইব? আর বাটী যাইব না। তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিব না, তাহাকে তিরস্কার করিব না, সে ছলনা, আমাকে লইয়া সে আর সুখী নয়,

আমি এখন তাহার সুখের পথের কণ্টক, এ কণ্টক দূর হওয়াই ভাল। সে সুখে থাক তাহাকে ভাল বাসিয়াছি, ভুলিতে পারিব না, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ভাল বাসিব, কিন্তু তাহার সহিত আর কথন আমার সাক্ষাৎ হইবে না; আমার সকল সুখের শেষ হইয়াছে, কার্য্যও শেষ হউক। যাব—যাব—কোথায় যাব? কোথা গেলে এ নিদারুণ চিন্তার হস্ত হইতে মুক্তি পাইব? মুক্তি পাইব কি? কে জানে! কিন্তু কোথায় যাই—আঠার মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবার সময় সে চিন্তা করিব। এখন কণি—তাহাকে এই পত্রখানি পাঠাইয়া দিতে হইবে, আর তাহাকে লিখিব—না না লিখিব না—আর তাহাকে আমি কিছুই লিখিব না—কিন্তু সে আমার সংকল্পের বিষয় জানিতে না পারিলে ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। তাহাকে পত্র লিখিতে হইবে, এ শুভ সংবাদ তাহাকে দিতেই হইবে। সে পত্র পাঠক পূর্ব্বে দেখিয়াছেন।

বেলা দুইটার সময় শ্রীশচন্দ্র চাকিয়া হইতে বিদায় হইলেন কিন্তু তিনি, বিলাসপুর না যাইয়া নিকটস্থ মহকুমায় গমন করিলেন, হটিয়া বিস্মিত হইল। শ্রীশচন্দ্র গন্তব্যস্থানে তাঁহার এক পরিচিত উকিল রামচরণ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রামবাবু শ্রীশবাবুকে দেখিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গেলেন? জলযোগাদি শিষ্টাচারের পরে শ্রীশচন্দ্র রামবাবুকে দিয়া কয়েকখানি দলিলের মুসুবিদা করাইয়া বলিলেন—কালই এ দলিল রেজেষ্টারী হওয়া চাই। রামবাবু তাঁহার মুহুরীকে ডাকিয়া সেইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন, সুতরাং

সে বেচারীকে সেদিন রাত্রে নিদ্রাদেবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীশচন্দ্রের দলিলের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইল।

পর দিবস যথাসময়ে দলিল গুলি রেজেষ্টরী করাইয়া, শ্রীশচন্দ্র তাঁহার শ্বশুরের নিকট দুইখানি এবং রামদাস বাবুর নিকট এক-খানি দলিল পাঠাইবার উপদেশ রাম বাবুকে দিয়া বৈকালে বিলাসপুর গমন করিলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া তিনি হটিয়াকে গাড়ীর সঙ্গে চাকিয়ায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিয়া ট্রেণে উঠিলেন; কিন্তু তিনি কলিকাতার গাড়ীতে না উঠিয়া বোম্বের গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। ষ্টেসন মাষ্টারের কৃপায় তিনি একখানি রিজার্ভ গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন, জনসঙ্ঘ তাঁহার সহ্য হইবে না।

হু হু শব্দে লৌহযান গ্রাম নগর পর্ব্বত প্রান্তর নদী বন ভাঙ্গিয়া ছুটিয়াছে, তাহারই একটি নির্জ্জন কক্ষে উপবিষ্ট শ্রীশচন্দ্রের চিন্তাস্রোতও সেইরূপ দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিলে লৌহ-যানের গতির বিরাম হইবে—শ্রীশচেন্দ্রর চিন্তার গতির বিরাম হইবে না—লৌহযানের নির্দ্দিষ্ট গতিরও মধ্যে মধ্যে বিরাম আছে কিন্তু তাঁহার চিন্তার সে বিরামও নাই। সংসার এমন কেন? মানুষ এমন কেন? এখানে কি কেহই সুখী নয়? কেন, আমি ত বেশ সুখে ছিলাম, ভগবান ত আমাকে সব দিয়াছিলেন—বিদ্যা, অর্থ পত্নীপ্রেম সংসারে যাহা কিছু সুখের আমার ত সে সবই ছিল—আমার অদৃষ্টে সে সুখ সহ্য হইল না। না—না অদৃষ্ট নয় অদৃষ্ট ত আনুসঙ্গিক ঘটনা-বলি—এযে আকস্মিক, ইহাকেই দৈব বলে; দৈব লোককে সুখী করে, আবার ডুবাইয়া মারে। আমারও মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু

যে মৃত্যুতে ইহ জগতে লোকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্টের অবসান হয়, সর্ব্ব যন্ত্রণার শেষ হয়, এ সে মৃত্যু নয়—এ জীবন্মৃত্যু। মৃত্যু হইলে ইহজগতে সকলের সহিত সম্বন্ধ শেষ হয়—আমার মৃত্যু না হইয়াও সকলের সহিত সব সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। কোথায় যাব! এ দারুণ দুঃশ্চিন্তার হস্ত হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি লাভ করিব! নিষ্কৃতি পাইব কি? না—না এ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি নাই! এ অসহ্য জীবন ভার লইয়া আমাকে কতদিন জীবিত থাকিতে হইবে কে বলিতে পারে? ভালবাসা, ভালবাসা কি? ভালবাসা যন্ত্রণা—নিদারুণ যন্ত্রণা। লোকে ভালবাসে কেন? আমি ভাল বাসিলাম কেন? যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য। ভালবাসিলেই কি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়? ভালবাসা কি কেহই জানেনা তথাপি ভালবাসে,—যন্ত্রণা পায়। ভাল বাসা সুখের জাগ্রত স্বপ্ন—নিদ্রার স্বপ্ন ভাঙ্গিলে স্বপ্ন-দৃষ্ট দুঃখ কষ্ট নিদ্রার সহিত চলিয়া যায়; জাগ্রত স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে তাহারা প্রবল হয়—আমার জাগ্রত স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে তাই আমার এত যন্ত্রণা।

নৈশ অন্ধকারে প্রকৃতির অস্পষ্ট ছবির মধ্যে শ্রীশচন্দ্র দেখিলেন, যেন কণিকার চক্ষু দুইটি কাতর ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, সে কাতরতার দৃষ্টি তাঁহার সহ্য হইল না, তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মানস-চক্ষের সম্মুখে কণিকার সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট হতাশা মাখা মলিন মুখখানি যেন সুস্পষ্ট রূপে ফুটিয়া উঠিল। সে চক্ষে কি কাতরতা, সে দৃষ্টি কি হৃদয়-ভেদী! শ্রীশচন্দ্র সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না; কল্পনায়ও কণিকার সেই মূর্ত্তি

তাঁহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিল, তিনি পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া অন্ধকারাবৃত অস্পষ্ট প্রকৃতির দিকে চাহিলেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল এই অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বত্রই যেন কণিকার বিষাদ মুখের ছায়া দেখিতে পাইতেছেন। তাহার সেই কাতর দৃষ্টি যেন হতাশায় ব্যাকুল ভাবে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে কাল্পনিক দৃষ্টির কাতরতা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি মুখ ফিরাইয়া গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি করিতেই তাঁহার দৃষ্টি গাড়ীর মধ্যে তাঁহার সম্মুখস্থ দর্পণে পতিত হইল, দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র চমকিত হইলেন। দর্পণে এ কাহার প্রতিবিম্ব! তাঁহার অজ্ঞাতসারে কেহ কি তাহার গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে? তিনি দর্পণ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, গাড়ীর মধ্যে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পুনরায় দর্পণের দিকে তাকাইতেই আবার সেই মূর্ত্তি তিনি দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলেন, তবে কি এ তাঁহারই প্রতিবিম্ব? এই দুই দিনে তাঁহার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে? তাঁহার বিশ্বাস হইল না, তিনি উঠিয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—হাঁ এ তাঁহারই প্রতিবিম্ব বটে; কিন্তু কি পরিবর্ত্তন—মস্তকের সম্মুখভাগের কেশ গুলি একদিনে অর্দ্ধেকের অধিক শুক্লবর্ণ হইয়া গিয়াছে—ললাটে গভীর রেখা অঙ্কিত হইয়াছে—চক্ষু রক্ত বর্ণ—কোটরপ্রবিষ্ট, দৃষ্টিশূন্য, চক্ষের কোণে কালি পড়িয়াছে, মুখ শুষ্ক পাংশুবর্ণ—এ মূর্ত্তির সহিত শ্রীশচন্দ্র তাঁহার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইলেন না, তথাপি চিনিতে পারিলেন এ তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি, অন্তরের তীব্র কালকূট তাঁহার মুখে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশচন্দ্র চলিয়া যাইবার পর দিবস, শশিশেখর চাকিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে গো শকট হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াই হটিয়া "দাদা মহাশয় আসিয়াছেন," বলিয়া ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। শশিশেখর তাহার কুশল বার্ত্তাদি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীশ কোথায় ?" তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হটিয়া বলিল, গত কল্য রাত্রে তিনি বোম্বের গাড়ীতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন. সে জানে না, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই, তিনি একাকী গিয়াছেন। হটিয়ার কথা শুনিয়া শশিশেখর ভাবিলেন কাল আসিতে পারিলে হয়ত ধরিতে পারিতাম, এখন সন্ধান পাওয়া কঠিন, কোথায় গিয়াছে কেমন করিয়া জানিতে পারিব। বৃদ্ধ বয়সে আমার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল। এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে তিনি হটিয়ার সহিত বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে রামদাস বাবুর নিকট সংবাদ গিয়াছিল, বাবুর শ্বশুর মহাশয় আসিয়াছেন, সে সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গলায় আসিয়া শশিশেখরের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, শশিশেখর তাঁহার নিকটও শ্রীশচন্দ্রের কোন সংবাদ পাইলেন না। রামদাস বাবু তাঁহার স্নান আহারের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিয়া কার্য্যে যাইতে উদ্যত হইলে,

শশিশেখর তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বলিলেন যে, শ্রীশ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই তিনি সেখানে আসিয়াছেন, তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। উত্তরে রামদাসবাবু বলিলেন, বাবু দুইদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইতেছেন বলিয়া এস্থান হইতে চলিয়া যান কিন্তু হটিয়ার নিকট তাঁহাকে বোম্বের দিকে যাইতে শুনিয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন ; তাহার পরে তিনি এক দিন পথেও বিলম্ব করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি যে কোথায় গিয়াছেন তাহার কোন সংবাদ তিনি পান নাই। রামদাসবাবুর কথা শুনিয়া শশিশেখর বলিলেন, "শ্রীশ কোথায় গিয়াছে বোধ হয় বিলাসপুর ষ্টেসনে সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।" রামদাস বাবু সে কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শশিশেখর পুনরায় বলিলেন "দেখুন রামদাসবাবু, এত বয়স হইয়াছে কিন্তু আমি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতার বাহিরে গমন করি নাই, আপনি যদি আপনার কার্য্যের ভার অন্য কাহারও উপর দিয়া আমার সঙ্গে যাইতে পারেন বড় ভাল হয়, শ্রীশ যদি বোম্বে গিয়া থাকে আমিও সেখানে যাইব, আপনি সঙ্গে থাকিলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

"যে আজ্ঞা, আমি মনোহর বাবুর প্রতি এখানকার কার্য্যের ভার দিয়া আপনার সহিত যাইব।"

"বেশ, তাহা হইলে আপনি প্রস্তুত হউন—হাঁ আর এক কথা আমার সঙ্গে অধিক টাকা নাই, কিছু টাকা সঙ্গে থাকা আবশ্যক। আপনাদের তহবিলে টাকা আছে ?"

"আজ্ঞা আছে, কত টাকার আবশ্যক ?"

"দুই শত টাকা হইলেই হইবে।"

"যে আজ্ঞা, দুই শত টাকাই আপনার নিকট দিতেছি।"

"আমার নিকট দিতে হইবে না, আপনিই সঙ্গে লইবেন।"

সেইদিনই শশিশেখর রামদাস বাবু ও হটিয়াকে সঙ্গে লইয়া বিলাসপুর আসিলেন এবং ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট অবগত হইলেন, শ্রীশচন্দ্র বোম্বে গিয়াছেন। তাঁহারাও শ্রীশচন্দ্রের অনুসন্ধানে বোম্বে যাত্রা করিলেন। বোম্বে যাইয়া কি উপায়ে শ্রীশচন্দ্রের সন্ধান পাইবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তা করিলেন না। শ্রীশচন্দ্র বোম্বে গিয়াছেন তাঁহারাও যাইতেছেন—বোম্বে পৌঁছিবার পূর্ব্বে শশিশেখর রামদাস বাবুকে, কি করিয়া শ্রীশচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে, রামদাস বাবু বলিলেন, তিনি পূর্ব্বে একবার বাবুর সহিত বোম্বেতে একটি ইঞ্জিন ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা সোরাবজীর হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন, বাবু যদি সেখানে থাকেন ভাল, নচেৎ সমস্ত সহর অনুসন্ধান করিতে হইবে। গাড়ী বোম্বে পৌঁছিলে তাঁহারা ভিক্টোরিয়া টারমিনাস হইতে একখানি গাড়ী করিয়া একেবারে সোরাবজীর হোটেলে গমন করিলেন। রামদাস বাবু সোরাবজীর পরিচিত, তিনি রামদাস বাবুকে যথেষ্ট আদর ও অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বাসগৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং রামদাস বাবুকে বলিলেন যে শ্রীশবাবু গতকল্য তাঁহার এখানে আগমন করিয়াছিলেন। রামদাস বাবু সে কথা শুনিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি কোথায়?"

সোরাবজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন "জানি না আজ সকালে বেলা আটটার সময় তিনি তাঁহার জিনিস পত্র লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

রামদাস বাবু তখন সোরাবজীর সহিত শশিশেখর বাবুর পরিচয় করিয়া দিয়া বলিলেন "ইনি বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য শ্রীশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, আপনি যদি একটু সাহায্য করেন আমরা বড়ই উপকৃত হই।" "আমার সাধ্য মত ত্রুটী হইবে না" বলিয়া সোরাবজী দরওয়ানকে ডাকাইয়া শ্রীশবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে দরোয়ান বলিল ছোট্টুর আস্তাবল হইতে সে শ্রীশবাবুর জন্য গাড়ী আনিয়া দিয়াছিল। সোরাবজী ছোট্টুকে ডাকাইলেন, সে বলিল, যে গাড়ীতে বাঙ্গালী বাবুকে নিয়ে গেছে সে গাড়ী এখনও ফিরিয়া আসে নাই। আসিলে তাহাকে সোরাবজীর নিকট পাঠাইয়া দিবে।

যথা সময়ে শশিশেখর ও রামদাস বাবু কোচম্যানের নিকট শুনিলেন, সে সেই বাঙ্গালী বাবুকে পি-ও কোম্পানীর জেটীতে নামাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। শশিশেখর মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, পি-ও কোম্পানীর জেটীতে? তবে কি শ্রীশ জাহাজে উঠিয়া কোথাও চলিয়া গেল? কাল বিলম্ব না করিয়া শশিশেখর রামদাস বাবুর সহিত পি-ও কোম্পানীর জেটীতে আসিয়া শুনিলেন বেলা দশটার সময় পি-ও কোম্পানীর ডবলিন নামক একখানি জাহাজ অষ্ট্রেলিয়ার মেল লইয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। টিকিট ঘরে সন্ধান করিয়া তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না—কিন্তু শ্রীশচন্দ্র

যদি পি-ও কোম্পানীর ডবলিন জাহাজে গমন করিয়া থাকেন তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, জাহাজ কলম্বো বন্দর হইয়া যাইবে, রামদাস বাবু কলম্বোবন্দরে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা বোম্বেতেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, সমস্ত হোটেলেই শ্রীশচন্দ্রের সন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিবসে কলম্বো হইতে উত্তর আসিল, শ্রীশচন্দ্র মুখার্জ্জি বলিয়া ডবলিন জাহাজে কোন আরোহী নাই। আরও দুই দিন তাঁহারা বোম্বে সহরে নানাপ্রকার নিষ্ফল অনুসন্ধান করিয়া নিরাশ্বাস হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রামদাসবাবু বিলাসপুরে নামিয়া গেলেন, হাটিয়া শশিশেখরের সহিত কলিকাতায় আসিল। শশিশেখর অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন—শ্রীশ কোথায় গেল, কণিকাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন, শ্রীশের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না—এ কথা কেমন করিয়া কণিকাকে বলিবেন, তিনি যে শ্রীশকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন বলিয়া কন্যাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছিলেন—তাহাকে তিনি যেরূপ কাতর দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাইলে সে কি আর বাঁচিবে? এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল—কণিকা যে তাঁহার বড় আদরের কন্যা; সুখী হইবে বলিয়াই যে তিনি তাহাকে শ্রীশচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অদৃষ্টে তিনি যে বড় সুখী হইয়াছিলেন, সেই জন্যই কি তিনি এই নিদারুণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলেন, কি করিবেন? কণিকার অদৃষ্টে যে এইরূপ ঘটিবে ইহা ত তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। অনেক চিন্তা করিয়াও তিনি

কণিকাকে সান্ত্বনা করিবার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

শশিশেখর কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার চারিদিন পরে তাঁহার নামে একটি রেজেষ্টারী প্যাকেট সাহপুর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল, মোহিতকুমার সে প্যাকেট গ্রহণ করিয়া কণিকার নিকট দিয়াছিলেন। প্যাকেটটি সেই অবস্থায় কণিকার আলমারীর মধ্যে তোলা ছিল। আজ শশিশেখর ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কণিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার তাঁহার সাহস নাই, তিনি গৃহিণীকে কলিকাতায় দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; শ্রীশচন্দ্র আসেন নাই, বিমলা কণিকার নিকট গিয়া বলিল "বাবা ফিরে এসেছেন!" কণিকা "জানি" বলিয়া নীরবে রহিল। বিমলা আবার বলিল "শ্রীশবাবুর কোন সন্ধান পান নাই।" উত্তরে কণিকা বলিল—"জানিতাম।"

কণিকার মুখের ভাব দেখিয়া বিমলা আর কিছু বলিল না; সেও কণিকার ন্যায় নীরবে তাহার নিকট বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কণিকার মাতা আসিয়া "মা কণিকা" বলিয়া ডাকিতে কণিকা শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিল "মা!" কণিকার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুহাসিনীর চক্ষে জল আসিল, কণিকা শয়ন করিয়াছিল, তিনি তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার মস্তকটি ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নীরবে তাহার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাতার নীরব সহানুভূতি কণিকার দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিল, অনেকক্ষণ পরে কণিকা চক্ষু মেলিয়া ডাকিল—"মা!"

"কি মা।"

"বাবার নামে একটা রেজেষ্ট্রী কাগজ আসিয়াছিল, সেটা আমার আলমারির মধ্যে আছে, সেটা বাবাকে পাঠিয়ে দাও।"

"সে পরে হবে, এত তাড়াতাড়ি কি জন্য ?

"মা, আমার মনে হচ্চে যেন সেই কাগজে কিছু খবর আছে।"

"ছাই আছে, আমার মাথামুণ্ড আছে—শ্রীশ যে আমার পরের কথা শুনে এমন করবে আমি কখন ভাবিনি, আজ যদি যোগেশ্বরী ঠাকুজ্জি বেঁচে থাকতেন।"

"তাঁর দোষ কি মা! দোষ আমার, আমি বুঝ্‌তে পারিনি।"

"তোমার দোষ কি মা, তুমি ত কোন অপরাধে অপরাধী নও।"

মাতার কথায় কণিকা কোন উত্তর করিল না—কিন্তু মনে মনে বলিল, অপরাধ করিয়াছি তাঁহার মনে সন্দেহ বিষের আগুণ জ্বালাইয়াছি, সে বিষের আগুণে তিনি পুড়িয়াছেন, আমি পুড়িয়াছি—ছেলেমানুষ মোহিত সেও সেই আগুণে ঝলসিয়া গিয়াছে, এ তাপের নিকট যে আসিয়াছে সে নিষ্কৃতি পায় নাই—এ আগুণ নিভিবার নয়—এ আগুণের প্রখরতা হ্রাস হইবার নয়।

এই সময়ে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক হইতে একটি বাবু একখানি নূতন চেকবহি এবং তাহাদের আদর্শ নাম স্বাক্ষরের খাতা লইয়া আসিয়া, কণিকা সুন্দরী দেবীকে তাহাদের সেই আদর্শ স্বাক্ষর-বহিতে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে বলিয়া, চেকবহি এবং খাতা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার নিকট জিজ্ঞসা করিয়া শশিশেখর অবগত হইলেন, ব্যাঙ্কের কর্ত্তা শ্রীশবাবুর নিকট হইতে এই আজ্ঞা

পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার নামের হিসাব এখন হইতে তাঁহার পত্নীর নামে পরিবর্ত্তিত হইবে, ব্যাঙ্কে শ্রীশবাবুর যে টাকা জমা আছে এখন হইতে সে সমস্ত টাকাই তাঁহার পত্নীর। শশিশেখর বাবুটিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া চেকবহি এবং নাম স্বাক্ষরের খাতা লইয়া কণিকার নিকট গমন করিলেন। কণিকা আদর্শ স্বাক্ষর পুস্তকে নাম লিখিয়া দিল, এবং চেকবহি খানি, পিতাকে রাখিতে বলিল, ইত্যবসরে কণিকার মাতা, আল-মারী হইতে সেই রেজেষ্টারী প্যাকেটটি বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি এতে যদি শ্রীশের কোন খবর থাকে।" শশিশেখর প্যাকেটটি খুলিয়া দুইখানি দলিল প্রাপ্ত হইলেন; একখানি দানপত্র এবং একখানি চুক্তিপত্র; তিনি ইংরাজী জানিলেও দলিল বুঝিবার মত জানিতেন না, এজন্য দলিল দুইখানি পত্নীর নিকট দিয়া তিনি বলিলেন মোহিতকে ডাকিয়া আনিতেছি সে বুঝাইয়া দিবে। অল্পক্ষণ পরে শশিশেখর ব্যাঙ্কের বাবুকে বিদায় করিয়া দিয়া মোহিতকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, মোহিত দলিল দুইখানি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিল। দানপত্রের সারমর্ম্ম শ্রীশচন্দ্রের স্থাবর অস্থাবর যাবদীয় সম্পত্তি তাঁহার পত্নী কণিকা সুন্দরীর এবং চুক্তিপত্রে শ্রীশচন্দ্র চাকিয়ার-খনির লভ্যাংশের দুই আনা রামদাসবাবু ইঞ্জিনীয়ারকে দিয়া গিয়াছেন। শশিশেখর বাবু রামদাস বাবুর সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি এবং বিষয় কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিবেন, কিন্তু কণিকা সুন্দরী ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে নিজের মনোমত লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

দান পত্রের কথা শুনিয়া কাহার মনে কি ভাবের উদয় হইল কে বলিতে পারে? কিন্তু কণিকার হৃদয় শ্রীশচন্দ্রের এই কঠোর উপহাসে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—অর্থ কি হইবে? অর্থে কি তাহার হৃদয়ের সন্তাপ দূর হইবে? না না—এযে অদৃষ্টের নির্ম্মম উপহাস—হতাশার ভীষণ ভ্রূকুটি!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুধাংশু বাবু তিন মাসের ছুটী লইয়া ভগ্ন-স্বাস্থ্য সংস্কারের নিমিত্ত পুরীতে অবস্থান করিতেছেন, বেলা ভূমির উপরেই তিনি একটি বাটী ভাড়া লইয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী এবং হেমাঙ্গিনীর কনিষ্ঠ সহোদর মুরারি এবং নেত্যদিদি। নেত্যদিদি হাতে করিয়া হেমাঙ্গিনী ও মুরারি প্রভৃতিকে মানুষ করিয়াছে, দাসী হইলেও সে একপ্রকার বাটীর কর্ত্রী।

সুধাংশু বাবু ইঞ্জিনীয়ার; গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী; সাত শত টাকা মাহিয়ানা পান, কিন্তু তিনি "অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরং" বাক্যটির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই শ্বশুরালয়ে বাস করেন—সৃষ্টি কর্ত্তা নারায়ণ স্বয়ং ক্ষীরোদ সাগর এবং সংহার কর্ত্তা শ্মশান বাসী সর্ব্বত্যাগী মহাদেবও যখন হিমালয় পরিত্যাগ করেন না, তখন সুধাংশু বাবুর এই শ্বশুরালয়বাস নিশ্চিতই দোষের হইতে পারে না, বিশেষতঃ সুধাংশু বাবুর শ্বশুরালয়ে বাসের একটি বিশেষ কারণও ছিল। সুধাংশু বাবুর অতি শৈশব কালে —তখন তাঁহার বয়স এত অল্প, যে সুধাংশু বাবুর সে কথা স্পষ্ট স্মরণ হয় না—আর একবার বিবাহ হইয়াছিল মনে হয় এবং সেই বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে তিনি একটি পরিচিতা বালিকার সহিত অনেক দিন খেলা করিয়াছিলেন মনে হয়। সে বালিকার

নাম বিমলা; তাহার সেই সুকোমল সুন্দর নয়ন-তৃপ্তিকর পবিত্র কচি মুখখানি, তিনি কখনই একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। নয়ন মুদ্রিত করিলে সেই সুন্দর মুখখানি—সেই বৃহৎ কৃষ্ণ তারকা বিশিষ্ট বড় বড় চোখ দুইটির সেই সরল-স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টি তাঁহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিত, তিনি সেই মুখখানি আর একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন।

দ্বিতীয় বার বিবাহের সময় সুধাংশু কুমার পিতার নিকট তাঁহার প্রথম বিবাহের উল্লেখ করায় সুধাংশু কুমারের পিতা গণেশ বাবু, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সে বিবাহের কথা বিস্মৃত হইতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, অধিক কি পিতা তাঁহার পাদ-স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন যে পিতার জীবন কালে, সুধাংশু কাহারও নিকট তাঁহার পূর্ব্ব বিবাহের কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। সুতরাং পিতা জীবিত থাকিতে সুধাংশু সে বিবাহের চিন্তাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শৈশবের মানস-পটে অঙ্কিত সেই বালিকার মুখখানি তিনি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই, মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টাও করেন নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি গোপনে বিমলার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, সেজন্য অর্থব্যয়েও তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধানে বা অর্থ ব্যয়ে কোন ফল হয় নাই।

সুধাংশু কুমারের পিতা গণেশ চন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু নরেন্দ্র নাথ হাজরী বাগের জেলা কোর্টে চাকরী করিতেন, পাঠ্যাবস্থা

হইতেই তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল, এবং সেই বন্ধুত্ব দৃঢ় করিবার জন্য গণেশ চন্দ্র তাঁহার মাতৃহীন সপ্তম বর্ষীয় পুত্র সুধাংশু কুমারের সহিত নরেন্দ্রনাথের পঞ্চম বর্ষ বয়স্কা কন্যা বিমলার বিবাহ দিয়াছিলেন। মানুষে একরূপ ভাবিয়া কার্য্য করে কিন্তু সে কার্য্যের ফল প্রায়ই অন্যরূপ হইয়া থাকে। গণেশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের বাল্য বন্ধুত্ব দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে, যে পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, এ বিবাহে তাহা দৃঢ়তর হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিবাহের অল্পদিন পরে সামান্য কারণে গণেশচন্দ্র কোপান্বিত হইলেন, নরেন্দ্র নাথ অনেক তোষামোদ করিয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না, গণেশচন্দ্র পেন্সনের মায়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অষ্টমবর্ষীয় পুত্র সুধাংশুকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। মাতার মৃত্যুর পর হইতে সুধাংশু অধিকাংশ সময়ই নরেন্দ্রনাথের বাটী থাকিতেন, বিমলার সহিত খেলা করিতেন, বিবাহের পরে আর তিনি পিতার নিকট থাকিতেন না; শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিতেন। তাহার পরে হঠাৎ একদিন পিতা তাহাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং মেসে একটি ঘর লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।-সুধাংশুকুমার কলিকাতার একটি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং গণেশচন্দ্র একটি সওদাগরী আফিসে প্রবেশ করিলেন। হাজারীবাগের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, এবং নরেন্দ্র নাথ, যাহাতে তাঁহাদের কোন সংবাদ না জানিতে পারেন গণেশচন্দ্র তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আট বৎসর পরে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময় সুধাংশু কুমার সম্মানের সহিত এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন, অমনি চারিদিক হইতে, দলে দলে দালাল আসিয়া গণেশচন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, অনন্যোপায় গণেশচন্দ্র, নিস্কৃতির জন্য দুর্গানাথ বাবুর কন্যা হেমাঙ্গিনীর সহিত পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন, সেই বিবাহের কথা শুনিয়া সুধাংশু পিতার নিকট তাঁহার প্রথম বিবাহের উল্লেখ করিয়াই পিতার নিকট শপথ বদ্ধ হন।

যথাসময়ে সুধাংশু কুমারের পুনরায় বিবাহ হইল, তাঁহার বাসস্থানও পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি গৃহ জামাতা রূপে দুর্গানাথ বাবুর বাটীতে স্থাপিত হইলেন এবং গণেশচন্দ্রও এতদিনে পুত্রভার হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। সুধাংশু কুমার এম এ পাশ করিয়া রুড়কী কলেজে ইঞ্জিনীয়ারী শিক্ষা করিতে গমন করেন এবং সেখান হইতে সম্মানের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গর্ভমেণ্টের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলেন। চাকরী স্থলে পত্নীর নানারূপ অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া সুধাংশু কুমার তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না, হেমাঙ্গিনী পিত্রালয়েই থাকিত, কিন্তু এবারে স্বামীর শরীর সুস্থ নহে বলিয়া হেমাঙ্গিনী জোর করিয়া তাঁহার সহিত পুরী আসিয়াছে এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারির শরীর ভাল নয় বলিয়া তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছে।

সুধাংশুকুমার প্রায় পনের দিবস হইল পুরীতে আসিয়াছেন; তিনি প্রত্যহ সমুদ্রে স্নান করেন; কোন কোন দিন হেমাঙ্গিনীও

তাঁহার সহিত সমুদ্র-স্নান করিতে আসেন। আজ তিনি একাকী আসিয়াছেন, স্নানের জন্য তিনি সমুদ্রে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় তিনি—একি দেখিলেন, এমন মুখ কি মানুষের হয়, এ যে ধ্যানের মূর্ত্তি—কল্পনার অগোচর—না না এ মুখ যে তাঁহার পরিচিত, এ মুখ যে তিনি দেখিয়াছেন—কোথায়? কোথায়? কিন্তু তিনি তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছেন না—হঠাৎ তাঁহার বাল্যসখী সেই বালিকার মুখখানি মনে পড়িল—তাই ত! সেই বালিকার মুখের সহিত এ মুখের যে প্রত্যেক অংশই মিলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র মুখখানির তুলনায় এ পূর্ণ আয়তন মুখখানি যেন অনেক অধিক মনোহর। সুধাংশুকুমার আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এক-দৃষ্টে সেই সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

দৃষ্টির কি আকর্ষণী শক্তি আছে? নচেৎ সে মুখখানি, সুধাংশুকুমারের মুখের দিকে অমন করিয়া চাহিবে কেন? একি! এ যে সেই চোখ! কিন্তু এ চক্ষে সেই সরল স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টির পরিবর্ত্তে একি দৃষ্টি—এ যে হৃদয়োন্মাদকারী সলজ্জ চঞ্চল দৃষ্টি। এ দৃষ্টি সুধাংশুকুমারের মর্ম্মস্থল ভেদ করিল—মুখখানি কিন্তু একজন অপরিচিতকে তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া, চোখোচোখী হইবা মাত্রই লজ্জিত হইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘোমটা টানিয়া দিল এবং তাহার সঙ্গিনী অপর একটি অসামান্যা সুন্দরীর হাত ধরিয়া সমুদ্র হইতে উঠিয়া গেল। সুধাংশু-কুমার ভাবিতে লাগিলেন—এ সুন্দরী কে? এই কি বিমলা? কিন্তু তাহা হইলে বিমলার সহিত অপর সুন্দরীটি কে? বিমলার কনিষ্ঠা

ভগিনী ? কিন্তু কই বিমলার ত ভগ্নী ছিল না, হয়ত পরে হইয়া থাকিবে, বিমলার সহিত তাঁহার বিশ বৎসর ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। একি যথার্থই বিমলা—না আমার মস্তিষ্কের উন্মাদ কল্পনা ? এই সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, ইহার সহিত আমার চির আদরের শৈশব সহচরীর সেই মুখের সাদৃশ্য দেখাইল—সেইমুখ—সেইচক্ষু—সে যে আমার হৃদয় পটে শৈশব হইতেই অঙ্কিত রহিয়াছে—কিন্তু কি বিভিন্ন—তথাপি সেই মুখ, এ নিশ্চয় বিমলা। সুধাংশুকুমারের আর স্নান করা হইল না। রমণীদ্বয় তখন প্রায় বেলা ভূমির অর্দ্ধাংশ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, সুধাংশুকুমার দ্রুতপদে তাহাদের অনুসরণ করিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে, রমণীদ্বয় বেলাভূমি পার হইয়া, গাড়ীতে উঠিলেন, এবং তাহাদের পশ্চাতে একজন ভীমকায় বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক গাড়ীর কোচবাক্সে আরোহণ করিলেন, গাড়ী চলিয়া গেল, আর অনুসরণ করা বৃথা ভাবিয়া সুধাংশুকুমার সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা গেল গাড়ীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

"ঘোড়া দেখিতেছিলেন, অতি সুন্দর ঘোড়া, অমন ঘোড়া পুরীতে আর একটিও নাই।"

চমকিত হইয়া সুধাংশুকুমার ফিরিয়া দেখিলেন, তোয়ালে স্কন্ধে একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন। তিনি উত্তর করিলেন—

"আজ্ঞা হাঁ, খুব ভাল ঘোড়া,—ও ঘোড়ার মালিক কে, আপনি বলিতে পারেন ?"

"গাড়ীতে যাঁরা এসেছিলেন ওঁরাই।"

"ওঁদের কি এখানেই বাড়ী?"

"আজ্ঞা না, কলিকাতায়, আপনি চাকিয়ার খনির কথা শুনিয়াছেন?"

"হাঁ, প্রথম বৎসরের কার্য্যের রিপোর্টে চাকিয়ার খনি ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করে, খনিটি শুনিয়াছি শ্রীশবাবুর, কিন্তু তিনিও শুনিয়াছি সেই বৎসর হইতেই নিরুদ্দেশ।"

"আমরাও সেইরূপ শুনিয়াছি, ঐ গাড়ীতে যাঁরা এসেছিলেন ওঁদের একজন শ্রীশবাবুর পত্নী কণিকা সুন্দরী দেবী, অপরা তাঁহার ভগিনী। শ্রীশবাবু প্রায় পাঁচ বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। কণিকা সুন্দরী এখন এখানেই থাকেন, সম্প্রতি তিনি পুরীতে একটি মন্দির এবং একটি অনাথ আশ্রম প্রস্তুত করাইতেছেন, কিন্তু সে মন্দিরে কোন দেবতা স্থাপিত হইবে না, তাঁহার স্বামীর প্রতিকৃতি স্থাপিত হইবে; তিনি তাঁহার পূজার জন্য ও স্বামী-সুখে বঞ্চিতা অনাথা স্ত্রীলোকদিগের আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চাকিয়া খনির সমস্ত আয় উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রকাণ্ড মন্দির এবং আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছে—শুনিয়াছি ইটালী হইতে শ্বেত-পাথরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া আনিবার জন্য শ্রীশবাবুর ফটোগ্রাফ সেখানে পাঠান হইয়াছে। ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর সেই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য তিন বৎসর সময় চাহিয়াছে, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ হইতেও প্রায় তিন বৎসর লাগিবে।

ভদ্র লোকটির নিকট এই সমস্ত অযাচিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া

সুধাংশুকুমার ভাবিলেন, তাঁহার অনুমান মিথ্যা ; তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত বিমলার ছবি মিথ্যা। এ স্ত্রীলোক কণিকা সুন্দরী অথবা তাঁহার ভগ্নী হইবেন—লুব্ধ আঁখি প্রতারিত হইয়াছে। বিমলা বোধ হয় এতদিন বাঁচিয়া নাই, এজীবনে আর তিনি তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন না ; কিন্তু তথাপি যেন তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, নিশ্চয় করিয়া না জানিতে পারিলে তিনি স্থির হইতে পারিবেন না, এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে অস্নাত ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি চান না করে ফিরে এলে যে, বাড়ীতে চান করবে ?"

স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সুধাংশুকুমার চমকিত হইয়া বলিলেন "তাইত চান না করেই ফিরে এসেছি যে, ভুলে গিইছি।" সুধাংশু কুমারের সেই অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া মুরারি হাসিয়া বলিল, "দিদি, বাঁড়ুয্যে মশায় নিশ্চই কোন নক্সার কথা ভাবতে ভাবতে চান করতে গিয়েছিলেন, আর তাই ভাবতে ভাবতে তিনি কি ক'রতে গিয়েছেন মনে নাই, বাঁড়ুয্যে মশায় যে সমুদ্রের ধারে বসে মাটীতে আঁক কাটতে সুরু করেননি এই সৌভাগ্য, নইলে এই দুপুর-রৌদ্রে আবার খুঁজতে বেরুতে হতো।"

মুরারির কথা শুনিয়া সুধাংশুকুমার হাসিয়া বলিলেন "ইস—মুরারি তোরও যে তোর দিদির হাওয়া গায়ে লাগলো দেখছি।"

হেমাঙ্গিনীও হাসিতেছিল সে স্বামীর কথা শুনিয়া বলিল, "দিদির হাওয়া কি রকম ?"

"এই বক্তৃতার হাওয়া।"

"আমাকে ত তুমি দিন রাতই বক্তৃতা ক'রতে দেখ, তা এখন চলো চান টান হবে না কি, ভাত তরকারী সব যে জুড়িয়ে গেল।"

"তোমরা খেয়ে নাওগে আমি এখনি নেয়ে আসচি।"

"অনেক বেলা হয়েছে বাড়ীতে কেন চান কর না।"

"যাব আর আসবো, সমুদ্রে চান ক'রে যে তৃপ্তি হয় বাড়ীতে তা হয় না ; আর এই কটা দিন, পরে বাড়ীতে চান ত বার মাসই আছে"—এই বলিয়া সুধাংশুকুমার গমনোদ্যত হইলে মুরারি বলিল "আমি সঙ্গে যাব বাঁড়ুযো মশায় ? সুধাংশু কুমার বলিলেন "কেন তুই কি চান করিস নি ?"

"আমি চান করেছি, তবে যদি আবার ভুলে যান—তাই !"

"যা যা আর জ্যেঠামি করতে হবে না" বলিয়া সুধাংশু কুমার প্রস্থান করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে পশ্চাতে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন যে গাড়ীতে উঠিয়া শ্রীশবাবুর পত্নী ও তাঁহার ভগিনী চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই গাড়ী খানি পুনরায় স্নানের ঘাটের দিকে আসিতেছে, গাড়ীতে কে আসিতেছে দেখিবার জন্য তিনি রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, পরক্ষণেই তাঁহার সম্মুখ দিয়া গাড়ি চলিয়া যাইতে তিনি আরোহীকে চিনিতে পারিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেন "রামবাবু !"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধু...র বিমলার সহিত পরিচয় হইবার পরে একদিন বিমলা আসিয়া কণিকার নিকট বসিয়া কণিকার ন্যায় একছড়া বোঁটা-কাটা মতিয়া বেলের মালা গাঁথিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে কণিকা বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন দিদি হঠাৎ আজ এ সখ কেন ?" বিমলা উত্তর করিল, "আজ আমার আবশ্যক হইয়াছে," কণিকা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, বিমলাকে মালা গাঁথা শিখাইয়া দিল। মালা গাঁথা শেষ হইলে বিমলার মালা দেখিয়া কণিকা বলিল "বাঃ—বেশত তুমি গুরুমারা বিদ্যে শিখলে দেখছি।" মালা দেখিয়া কণিকার লোভ হইয়াছিল, তাহার ইচ্ছা হইল বিমলার সহিত মালা পরিবর্ত্তন করিয়া লয়, শ্রীশ বাবু কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম, করিয়াছেন আজ তিনি মধুপুরে আসিতেছেন। তাই কণিকা আজ তাঁহার জন্য মালা গাঁথিতে বসিয়াছিল, বিমলা মালা ছড়াটি ধীরে ধীরে কণিকার গলায় পরাইতে যাইলে, সে লজ্জায় দুইপদ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না আমার হাতে দাও!"

"না তোমার মনের মানুষের জন্য তুমি যে মালা গেঁথেছ সেই মালা তার গলায় পরিও আমি আমার মনের মানুষকে পরাব ব'লে গেঁথেছি—আমি তাকেই পরাব,"—এই বলিয়া বিমলা তাহার মালা

ছড়াটি কণিকার গলায় পরাইয়া দিল। বিমলার অবস্থা স্মরণ করিয়া কণিকার কোমল হৃদয় আর্দ্র হইল, কণিকার চক্ষে জল দেখিয়া বিমলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল "তোর যে ভাব লেগে গেল দেখছি!"

কণিকা চমৎকৃত হইয়া বলিল "তুমি হাসছো দিদি" বিমলা বলিল "কাহার জন্য কাঁদিব? স্বামীর জন্য? কেন তাঁহাকে পাইতেছি না তাহাতে ক্ষতি কি? তাঁহাকে পাইলে সেবা করিতে পাইতাম আমার অদৃষ্টে সে পুণ্য নাই তাঁহার সেবা করিতে পাইলাম না, আমি দূর হইতে আমার দেবতার পূজা করিতে পাইতেছি তাহাতেই আমার নারী-জন্ম সার্থক বিবেচনা করি। যাহারা সেবার অধিকার পায় তাহারা পুণ্যবতী—ভাগ্যবতী।"

সে দিন শ্রীশচন্দ্র আসিলে কণিকা অন্য দিনের মত শ্রীশচন্দ্রের গলদেশে মালা পরাইয়া না দিয়া পদযুগলে মালা রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। শ্রীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ওকি কণা, ফুল কি পায়ে দিতে আছে?"

"দেবতার পায়ে দিতে আছে" বলিয়া কণিকা মালা ছড়াটি শ্রীশচন্দ্রের পায়ের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিল, এবং শ্রীশচন্দ্রের নিকট ন্যায্য মূল্য অপেক্ষাও অধিক পুরস্কার লাভ করিল। শ্রীশচন্দ্র বলিলেন "আমি মানুষ কণা—আমি মানুষ, আমিও পাষাণ কিংবা দারুমূর্ত্তি চৈতন্য বিহীন দেবতা হইতে চাহিনা।"

"কে তোমাকে দেবতা হতে বলছে—দেবতার প্রাণ নাই,

তাঁহার পূজা করিয়া প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না; তোমার পূজা করিয়াই আমার তৃপ্তি, সেবা করিতে পাওয়া ভাগ্য।"

শ্রীশচন্দ্র কণিকার মুখে অদ্য এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কণিকা বলিত স্বামীর সহিত তাহার সমান অধিকার, সে যেমন স্বামীকে ভালবাসে স্বামীরও তাহাকে সেইরূপ ভালবাসিতে হইবে; সে তাহার ন্যায্য অধিকার—সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেনা—সে তাহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে না এবং স্বামীকেও তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতে দিবেনা। সহসা আজ কণিকার মুখে, স্বামীর সেবা করিতে পাওয়া ভাগ্য এই বিপরীত কথা শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র দুই হস্তে কণিকার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন "আজ কি হয়েছে, সংসার কি ওলট পালট হয়ে গেল নাকি?"

"সংসার হয়নি, ভয় নাই সব ঠিক আছে, এই আমিই কেবল ওলট পালট হয়ে গিইছি!"

"কেন হঠাৎ তোমার এ ভাবের কারণ?"

"কারণ আছে।"

"কি, শুনতে পাই না।"

"গুরু পেয়েছি।"

"সে আবার কে?

"কেন, দিদি!"

"দিদি আবার তোমার কে কোথা থেকে এল?"

"কেন বিমলা দিদি?"

শ্রীশচন্দ্র বুঝিলেন, বিমলার নিকট আজ কণিকা পরাস্ত হইয়াছে।

বিমলার জন্য তাঁহার দুঃখ হইল, তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার এ ভাব আমার ভাল বোধ হচ্চে না, আমি কি শেষে তোমাকে হারাব না কি!" কথাটি উচ্চারণ করিয়া শ্রীশচন্দ্রের মনে যেন কোন অনিশ্চিত আশঙ্কার উদয় হইল। পরমুহূর্ত্তেই তিনি সে ভাব দূর করিয়া কণিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বাঙ্গলার নিম্নে নামিয়া আসিলেন। কণিকা বলিল "ও কি—ছিঃ! নামিয়ে দাও, কে দেখবে!" "রাত্রি দশটার পরও যদি কেউ আড়ি পেতে থাকে—নারাজ!"

পুষ্পোদ্যানে আসিয়া শ্রীশচন্দ্র কণিকাকে নামাইয়া দিলে কণিকা বলিল, "দেখ দেখি আমার চুলগুলো কি করে দিলে!"

"আচ্ছা—আচ্ছা ভাল করে দিচ্চি" বলিয়া শ্রীশচন্দ্র কণিকার খোপা খুলিয়া দিলেন।

তাহার সেই স্বামী। তাহার পর হইতে সে সাবিত্রী ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে, তাহার সর্ব্বনাশ হইল। এ সর্ব্বনাশা ব্রত পরিত্যাগ করিতে নাই, উদ্যাপন করিতে হইবে। সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করিয়াই কি তাহার এই শাস্তি হইল—সে কি সাবিত্রীব্রত গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নয়—কিংবা বুঝি সে প্রথম হইতে স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে শিখে নাই ইহা তাহার সেই পাপের ফল! তাহাই সম্ভব; বিমলা দিদি স্বামী না পাইয়া পূজা করে, আমি পাইয়া পূজা করি নাই; আমি মহাপাপিষ্ঠা, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। কত দিনের কত কথা তাহার মনে হইত, কত সুখের স্মৃতি তাহার মনে

জাগরিত হইয়া ক্ষণেকের জন্য অমানিশা মেঘান্ধকারে সৌদামিনী হাসিত, পরক্ষণেই ভীমতর অন্ধকারে কত কার্য্যে তাহার ত্রুটিগুলি মানসচক্ষে ঘোর কৃষ্ণাকারে পতিত হইত। সেই গৃহ, সেই আনন্দাগার, সেই কোকিল-কুহরিত জ্যোৎস্না-মণ্ডিত পুষ্পমালা-শোভিত ভ্রমর গুঞ্জিত নিকুঞ্জবন—সেই সব রহিয়াছে, কিন্তু তাহার কিছুই নাই। তাহার দেবতা যে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এ আর তাহার আনন্দাগার নহে, এ এখন তাহার কারাগৃহ ; এখানে সে থাকিতে পারিবে না, এ জনকোলাহলপূর্ণ সাধের পুণ্যবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যাইয়া স্বামীর পূজা করিবে।

বিমলাকে লইয়া পুরুষোত্তম দেখিতে আসিয়া সমুদ্র দেখিয়া তাহার বড় ভাল লাগিল, অনন্তের অবিরাম গর্জ্জনধ্বনি, তাহার আর্ত্ত প্রাণে আর্ত্তের অনন্ত বিলাপ বলিয়া অনুভূত হইল, সে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবে মনস্থ করিল, শ্রীমন্দির দেখিয়া তাহার স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠার অভিলাষ হইল। সে নিজের অভিলাষ রামদাস বাবুকে জানাইল।

নবম পরিচ্ছেদ

গণেশচন্দ্রের হাজারীবাগ পরিত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কিন্তু গণেশচন্দ্রের সতর্কতার জন্য তাঁহার সে অনুসন্ধানে কোন ফল হয় নাই। একে একে একাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল, এত দিনের মধ্যেও নরেন্দ্র নাথ গণেশচন্দ্র বা সুধাংশু কুমারের কোন সংবাদই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। শৈশবে কন্যার বিবাহ দিয়া তিনিই কন্যাকে জন্ম দুঃখিনী করিয়াছেন এই অনুশোচনায় তিনি সর্ব্বদাই অন্তরে দগ্ধ হইতেন। বিমলার বয়ঃ-ক্রম এক্ষণে ষোড়শ বৎসর, সে অত্যন্ত সুন্দরী সুতরাং সে পিতামাতার নিকট হইতে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা অবগত হইতে না পারিলেও পাড়ার হিতৈষিণীগণের নিকট হইতে সালঙ্কারে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা অনেক পূর্ব্বেই শুনিতে পাইয়াছিল। এই শুভানুধ্যায়িগণেরা দুঃখ করিয়া বলিতেন, "যা হোক মা তোমার অদৃষ্টে যা ছিল হয়েছে, আর একটা বছর সধবার মত থেকে মাছ ভাত খেয়ে নাও, তারপর থেকে তোমাকে বিধবার আচারে থাকতে হবে।" বিমলার সমবয়সী সরসী সে কথা শুনিয়া বলিত "কেন আর একবছর বাদে বিমলার কি হবে?" শুভানুধ্যায়িদিগের মধ্যে সুখদা নাম্নী একজন বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি হাজারীবাগের সরকারী পিসি, সুতরাং লোকের বিপদে সম্পদে, সকল বাটীতেই অনাহুত

হইয়া গমনাগমন করিতেন। স্বামী মৃত্যুকালে একখানি বাড়ী ও কিছু নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং পিসি নিশ্চিন্ত মনে পরচর্চ্চা এবং পরানন্দা করিয়া বেড়াইতে পারিতেন। সরসীর প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সোয়ামী বার বছর নি-উদ্দেশ হ'লে, মেয়ে মানুষের সোয়ামীর শ্রাদ্ধ ক'রে বিধবা হ'তে হয়।" সরসী তাহাতে বলিল, "কিন্তু স্বামী যদি বেঁচে থাকেন?" পিসি হাত মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "বেঁচে থাকলেও করতে হয় শাস্তোরে এই কথা বলেছে।"

বিমলা কোন কথা কহিল না; কিন্তু তাহার মনে অত্যন্ত ভয় হইল। স্বামীর সহিত অবশ্য তাহার কখন সাক্ষাৎ হয় নাই; পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাহার বিবাহ হইয়াছিল, স্বামীর কথা তাহার মনে পড়ে না, কিন্তু বিবাহের কথা অল্প অল্প স্মরণ হয়। জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত সে মনে মনে স্বামীর নামটী পূজা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু শাস্ত্র যদি দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশের পরে স্বামীর শ্রাদ্ধ করিতে বলে, বিধবার বেশ ধরিতে বলে, সে কেমন করিয়া তাহা পালন করিবে? তাহার মনে স্থির বিশ্বাস, তাহার স্বামী জীবিত আছেন, অন্যথা হইলে সে তাহা জানিতে পারিত; কিন্তু কেমন করিয়া, তাহা সে জানে না; সুতরাং সে শাস্ত্রবিধি পালন করিতে পারিবে না, তাহাতে যদি তাহাকে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হয়, সে হাসিমুখে তাহাতে ও প্রস্তুত; কিন্তু যাহাতে স্বামীর অকল্যাণ হইবে সে কার্য্য তাহার দ্বারা হইবে না।

নরেন্দ্র বাবু বিমলার দুর্ভাগ্যের জন্ম আপনাকে অপরাধী মনে

করিয়া, বিমলাকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে নিজেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিমলা যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতি ছিল। তাহার দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় একদিন নরেন্দ্র বাবু তাহাকে বলিলেন, "মা আমার যত দূর বিদ্যা ছিল, তোমাকে শিখাইয়াছি, তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি একজন পণ্ডিত রাখিয়া দিই।"

বিমলা বলিল, "না বাবা, আমি আর প'ড়ব না, আপনার নিকট যা শিখেছি তাই যথেষ্ট।"

নরেন্দ্র বাবু অবশ্য বিমলাকে ইংরাজী শিক্ষা দেন নাই, কিন্তু বাঙ্গলা এবং সংস্কৃতে তাঁহার যতদূর বিদ্যা ছিল, তাহা তিনি অকপটে কন্যাকে দান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সরকারী পিসির নিকট ঐ সকল কথা শুনিয়া সে একদিন তাহার মাতার কাছে তাহা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করিল; বিমলার মাতা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "আমাদের দেশের এই রীতিই বটে।"

মাতার কথা শুনিয়া বিমলা বলিল, "মা, তুমি বাবাকে বল, আমি নিশ্চয়-খবর না পেলে, কখনই ও নিয়ম পালন করতে পারব না; তা'তে যদি আমাকে তোমাদের পরিত্যাগ ক'রে যেতে হয়, আমি তাও যাব, নিতান্ত না পারি, যেমন করে পারি মরব।"

নরেন্দ্রনাথের পেনসনের সময় হইয়াছিল; তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি দরখাস্ত করিয়া তাঁহার কার্য্যকাল আরও কিছু দিন বাড়াইয়া লইবেন। কিন্তু পত্নীর নিকট কন্যার কথা শুনিয়া তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কন্যাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন,

তিনি ভাবিলেন,—শুধু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে হইবে না, তাঁহাকে শীঘ্র হাজারীবাগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদিও হাজারীবাগ তাঁহার জন্ম স্থান নয়, তিনি পঁচিশ বৎসর এখানে চাকরী করিতে-ছেন এবং এখানে নিজের গৃহবাটীও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে থাকিতে হইলে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করা চলিবে না। সুতরাং তিনি হাজারীবাগ পরিত্যাগেরই সংকল্প করিলেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন? যেখানে যাইবেন সামাজিক বিধি তাঁহার সঙ্গে যাইবে। অনেক চিন্তা করিয়া তিনি দেখিলেন কলিকাতায় সামাজিক বিধির প্রাধান্য নাই, কলিকাতায় এ সামাজিক ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবে না; সুতরাং তিনি কলিকাতায় যাওয়াই স্থির করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অশ্বিনীকুমার বিমলার অপেক্ষা প্রায় দশবৎসরের বড়। অশ্বিনী কুমারের পরে নরেন্দ্রনাথের আরও দুইটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা সুতিকাগার হইতেই পিতামাতার দেনা পাওনা শোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিমলা তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও শেষ সন্তান; সুতরাং বিমলার জন্য যে হাজারীবাগ পরিত্যাগ করিবেন ইহার আর বিচিত্র কি? অশ্বিনী-কুমার এই সময়ে কলিকাতার কোন্ কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, হোগল-কুড়িয়ায় একখানি ছোট দ্বিতল বাটী ক্রয় করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে হাজারীবাগের সহিত সকল সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এই জন্যই

সুধাংশুকুমার পিতার মৃত্যুর পরে হাজারীবাগে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। কলিকাতায় আসিবার তিন বৎসর পরে বিমলার পিতার মৃত্যু হয় এবং তাহার পরে ছয় মাসের মধ্যে তাহার মাতাও তাঁহার অনুসরণ করেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে অশ্বিনী বাবু পুত্রের অসুস্থতার জন্য কিছুদিনের জন্য, মধুপুরে তাঁহার সহপাঠী যদুনাথ মল্লিকের বাঙ্গলো "মল্লিক লজে" বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্রও সেই সময়ে কণিকার স্বাস্থ্যের জন্য মল্লিক লজের পার্শ্বেই একখানি বাঙ্গলো ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। এই স্থানেই বিমলার সহিত কণিকার পরিচয়, এবং পরে সদ্ভাব হয়। বিমলার কথা শুনিয়া তাহার দুঃখে কণিকার হৃদয় গলিয়া গেল। সে বিমলার হাত ধরিয়া বলিল, "দিদি, আমার দিদি নাই, আজ হইতে তুমি আমার দিদি হইলে, বল তোমার ছোট বোনের কাছে এসে মাঝে মাঝে থাকবে?" বিমলাও কণিকাকে ভাল বাসিয়া ছিল এবং সেই ভালবাসা ক্রমে তাহাদের যথার্থ সখিত্বে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীশচন্দ্র চলিয়া যাইবার পূর্ব্ব হইতে বিমলা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কণিকার নিকট আসিয়া অবস্থান করিত। চারি বৎসর পরে কণিকা একদিন বিমলাকে বলিল, "দিদি, আমার মন আর কলকাতায় থাকতে চাচ্ছে না।"

"কোথায় যাবি?"

নবম পরিচ্ছেদ

কণিকা তখন বিমলার নিকট পুরীতে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও অনাথা আশ্রম স্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, বিমলার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে বিমলা তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। তাহার পরে কণিকা বিমলাকে ধরিয়া বলিল, "দিদি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

বিমলা। "আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু দাদা কি মত ক'রবেন?" কণিকা বলিল, "দাদার মত আমি করিয়ে নেবো।" কণিকাও অশ্বিনীবাবুকে দাদা বলিত।

অশ্বিনী বাবু একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জল-যোগান্তে বাহিরের ঘরে বসিয়া একখানি মনস্তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়, তাঁহার পত্নী রাধারাণী আসিয়া বলিল, "কণা ঠাকুরঝি এসেছে, তোমাকে ডাকছে।"

পত্নীর কথা শুনিয়া অশ্বিনী বাবু চমৎকৃত হইলেন। কণিকা তাঁহাদের বাটীতে আসে—তিনি জানেন, তাঁহাকে দাদা বলে তাহাও জানেন, কিন্তু কণিকা ত এতদিনের মধ্যে কখন তাঁহার সহিত কথা কহে নাই কিম্বা তাঁহার সম্মুখেও আসে নাই। কণিকা তবে তাঁহাকে ডাকিতেছে কেন, আবার কি তাহার কোন বিপদ হইল? তিনি 'মনস্তত্ত্ব' ফেলিয়া ভিতরে আসিতেই কণিকা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দাদা, আমি আপনার নিকট ভিক্ষার জন্য এসেছি।" অশ্বিনী বাবু হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কণিকার রাজার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার বাটীতে মাসের মধ্যে সে, যে সব দ্রব্য-সামগ্রী পাঠায় সে সব তাঁহারা পূর্ব্বে কখন চক্ষেও দেখেন নাই। তিনি দেড়

শত টাকা মাহিনায় সামান্য প্রফেসারি করেন, তিনি কণিকাকে কি ভিক্ষা দিবেন? তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কণিকা বলিল, "দাদা, আমি বড় মুখ ক'রে আপনার নিকট ভিক্ষা চাইতে এসেছি, বলুন, দেবেন?" অশ্বিনী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, "তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পাচ্ছি না।" কণিকা পুনরায় বলিল, "আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাইতে এসেছি।" অশ্বিনীবাবু বলিলেন, "আমার কি আছে যে তোমায় ভিক্ষে দিতে পারি দিদি!"

"আপনার যা আছে আমি তাই চাই, বলুন দেবেন?"

"তুমি নিয়ে সন্তুষ্ট হও, দিব।"

কণিকা বিমলার হাত ধরিয়া বলিল "বিমলা দিদিকে আমায় দিতে হবে দাদা।"

অধ্যাপকের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। অধ্যাপকগণ প্রায়ই সংসার-জ্ঞান-বিহীন হইয়া থাকেন, সুতরাং কণিকা ভিক্ষার কথা বলিলে তাঁহার ভয় হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বিম্‌লিকে নিয়ে তুমি কি ক'রবে বোন্?"

"আমি পুরী যাচ্চি, দিদিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।"

অধ্যাপক-গৃহিণী এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই, এবার তিনি বলিলেন "আমরা বুঝি কেউ নই ঠাকুরঝি?" কণিকা বলিল, "আমার কি এমন ভাগ্য হবে বউ দি, যে তোমরা আমায় সে অনুগ্রহ করবে?"

দশম পরিচ্ছেদ

কণিকাসুন্দরী পুরীতে যে মন্দির ও অনাথাশ্রম নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, রামদাস বাবু তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। মন্দির এবং আশ্রমের নক্সাও তিনি করিয়াছিলেন, এই জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মাণ পরিদর্শনের জন্য পুরী আসিতে হইত। তিনি অদ্য সকালে আসিয়াছিলেন; কণিকাসুন্দরী ও বিমলা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারও সমুদ্রে স্নান করিবার ইচ্ছা হইল; তিনি গাড়ী খুলিয়া দিতে বারণ করিলেন এবং সত্বর স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ "রামবাবু" বলিয়া কে তাঁহাকে আহ্বান করিল। দেখিবার জন্য তিনি গাড়ী হইতে অবতরন করিলেন, সুধাংশুকুমারও ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামদাস বাবু সুধাংশুকুমারকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে বলিলেন, "তুমি এখানে কত দিন এসেছ?" উত্তরে সুধাংশুকুমার বলিলেন, "আমি দিন পনেরো এসেছি, তুমি কত দিন?"

রা।—উপস্থিত আজ সকালে, তবে আমাকে মাঝে মাঝে এখানে আসতে হয়; তার পর—তোমার খবর কি বল?

সু।—আমার খবর প্রিভিলেজ লিভ, সেই সুযোগে দিন কতক সমুদ্রে স্নান।

রা।—আর সেই সঙ্গে ব্যাগারের দৌলতে সোণার গাঁ দেখার মত জগন্নাথ দর্শন।

সু।—হ্যাঁ এক রকম তাই বটে। তবে কি জান, মহাপ্রভুর এ অধমের প্রতি আজও সে কৃপা হয় নি, আর বাবাজীর যে থাপসুরত চেহারা, তাতে কৃপা যত অল্প হয় ততই মঙ্গল।

রা।—এখনও সেই সাবেক ভাব আছে দেখছি, আর একটু রক্ত ঘন হ'য়ে না এলে আর ও ভাবটি যাবে না।

সু।—আচ্ছা—আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে, এখন তুমি উঠেছ কোথায়?

রা।—মনিব বাড়ী।

সু।—মনিব বাড়ী!

রা।—যাঁর চাকরী করি তিনিই মনিব, তাঁর বাড়ীই মনিব বাড়ী।

সু।—তুমি ত চাকিয়ার খনির ম্যানেজার ও ইঞ্জিনীয়ার?

রা।—শুধু চাকিয়ার খনির ম্যানেজারিতে কুলোতে পারি কই? গিরিডি, হাজারীবাগ আর চাকিয়া এই তিনটি খনির কার্য্যই আমাকে দেখতে হয়, তার পর ধলভূমে একটি পাথরের খাদ আছে তাও আমাকে দেখতে হয়।

সু।—শ্রীশবাবুর স্ত্রী এখানে যে মন্দির ও আশ্রম ক'চ্ছেন সেও তোমাকে দেখতে হয়?

রা।—হাঁ, সেটা ফাউ।

সু।—ফাউ কি রকম?

রা।—উপরি পাওনা, বুঝেছ ?

সু।—বুঝলাম। শ্রীশবাবু কোথায় ?

রা।—শ্রীশবাবু জানেন, আর ভগবান জানেন।

রামদাস বাবুর নিকট সেই স্ত্রীলোকটি কে জানিতে পারা যাইবে ভাবিয়া সুধাংশুকুমার বলিলেন, "শ্রীশবাবুর পত্নী ও তাঁহার ভগিনী একটু পূর্ব্বে স্নান করিয়া গেলেন না ?"

রা।—হ্যাঁ, তবে তাঁরা পরস্পরের প্রকৃত ভগ্নী নন।

সু।—আমাকে পুরীর একটি ভদ্রলোক বললেন, শ্রীশবাবুর স্ত্রী ও তাঁহার ভগ্নী।

রা।—তিনি মিথ্যা বলেন নাই, তবে সেটি ওঁদের ধর্ম্ম সম্পর্ক, আমাদের কর্ত্রীকে বিমলা দেবী অত্যন্ত স্নেহ করেন।

বিমলা দেবী নাম শুনিয়া সুধাংশুকুমার চমকিয়া উঠিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা দেবীর বাটী কোথায় ? তিনি কে ?"

রা।—জানি না, তবে তিনিও জন্মদুঃখিনী ; অতি শৈশবে তাঁর বিবাহ হয় তার পর কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁর শ্বশুর তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেন।

সুধাংশুকুমারের সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল, হৃদপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি সুস্পষ্টরূপে তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল ; চক্ষে জল আসিল। তিনি অনেক চেষ্টায় আত্ম সম্বরণ করিয়া চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর ?"

রা।—তারপরে আবার কি ? পূর্ব্বে কুলীনের ঘরে ঘরে যা

নিত্য নৈমিত্তিক ছিল তাই! বিমলা পিত্রালয়েই রহিয়া গেল। তাহার স্বামীও কখন তার উদ্দেশ করে নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মধুপুরে আমাদের কর্ত্রীর সহিত তাঁর পরিচয় হয়, সেই হ'তে তাঁদের এই ধর্ম্ম সম্পর্ক। বড় লক্ষ্মী মেয়ে, যেমন রূপ, তেমনি-গুণ, দুজনেই সমান! ভগবান যে এঁদের অদৃষ্টে এত কষ্ট লিখেছিলেন কেন জানি না। দুজনে অত্যন্ত প্রণয়, শ্রীশবাবু নিরুদ্দেশ হওয়ার পর হ'তে এঁরা প্রায় একসঙ্গেই আছেন।" সুধাংশু ভাবিলেন এ নিশ্চয় তাঁহার বিমলা—শৈশবে বিবাহিতা, শ্বশুর পরিত্যক্তা, নামও বিমলা—এ সেই! দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি স্থির নিশ্চয়ের জন্য বলিলেন, "আচ্ছা রাম, তুমি বিমলার পিতার নাম কি বলতে পার?"

রা।—জানিতাম, কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না, তবে এঁর ভ্রাতা অশ্বিনীবাবু আমাদের প্রফেসর ছিলেন।

ঔৎসুক্যপূর্ণ কণ্ঠে সুধাংশু কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশ্বিনী মুখুজ্জে?"

রা।—হ্যাঁ, তুমি চেন নাকি, তুমি ত প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলে?

সু।—এঁদের পিতার নাম কি নরেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে?

রা।—হ্যাঁ—হ্যাঁ, নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ই বটে, তিনি হাজারীবাগে পূর্ব্বে চাকরী করতেন, সেই খানেই কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। এখন এস, গাড়ীতে উঠ, চল স্নান ক'রে আসি, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।

যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় সুধাংশুকুমার রামদাস বাবুর সহিত

গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে—এই বিমলা—এই তাঁহার সেই শৈশব সহচরী, পতি বিরহিণী চির দুঃখিনী বিমলা! ইহার জন্য তিনি কত অর্থব্যয় কত অনুসন্ধান করিয়াছেন! তাঁহার মন তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল। তিনি সেই সুদূর বাল্যের স্মৃতি একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কখন পারিতেন না, মরণেও বোধ হয় স্মৃতি তাঁহার সহিত গমন করিত। তাঁহার বিমলা বাঁচিয়া আছে, তিনি কতদিন পরে তাহার দেখা পাইয়াছেন, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন যুগপৎ হর্ষ বিষাদে অভিভূত হইল। তিনি প্রথমে ভাবিলেন রামদাস বাবুকে সব কথা খুলিয়া বলেন, কিন্তু পরে কি মনে করিয়া বলিলেন, বিমলাদেবী তাঁদেরই কুলবধূ। অনেক অনুসন্ধান ক'রেও তাঁর কোন সংবাদ পান নাই; ভগবানের কৃপায় আজ তিনি তাঁর সন্ধান পেয়েছেন, তিনি বৈকালে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতে যাবেন। রামদাস বাবু সুধাংশুকুমারের কথা শুনিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর স্বামী জীবিত আছেন কি?"

সু।—আছেন।

রা।—কোথায় আছেন তুমি জান?

সু।—জানি; তিনি অনেকদিন থেকে তাঁর পত্নীর অনুসন্ধান করছেন।" অশ্রুপূর্ণ লোচনে রামদাসবাবু বলিলেন, "তাঁহাকে সংবাদ দাও; আহা অভাগিনী পতি কাঙ্গালিনী, আজন্ম দুঃখিনী, ভগবান বুঝি এতদিনে তার প্রতি সদয় হলেন।"

স্নানান্তে রামদাসবাবু সুধাংশুকুমারকে তাঁহার বাসার সম্মুখে

নামাইয়া দিয়া গেলেন; সুধাংশুবাবু বলিলেন বৈকালে বিমলা-দেবীর সহিত দেখা করিতে যাইবেন এবং দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত রামদাস বাবুকে, তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। রামদাসবাবু কারণ জানিতে চাহিলে সুধাংশুকুমার বলিলেন,—"কারণ বৈকালেই জানতে পারবে।" রামদাসবাবুও মনিব বাটীতে এই-মাত্র সংবাদ দিলেন, যে বিমলাদেবীর শ্বশুরালয় হইতে অন্ত বৈকালে একব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। সংবাদ পাইয়া বিমলা ভাবিল, শ্বশুর বাটী হইতে কে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে? সেত কাহাকেও চিনে না, সে কেবল তাহার স্বামীর ও শ্বশুরের নাম মাত্র জানে, স্বামীকে তাহার মনে পড়ে না, শ্বশু-রেরও মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়াছিল—তবে কি তাহার স্বামী তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন? তাহা কি সম্ভব? এতদিন পরে কি তাঁহার বিমলার কথা মনে পড়িয়াছে? তিনি ত পুনরায় বিবাহ করিয়া-ছিলেন এবং এতদিনের মধ্যে একবারও তাহার সংবাদ লন নাই—কিন্তু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে কে? তিনি ত কাহাকেও চিনেন না, অপরিচিতের সহিত তিনি কেমন করিয়া সাক্ষাৎ করিবেন? না—না তিনি দেখা করিতে পারিবেন না; যিনি দেখা করিতে আসিবেন তিনি কে, কি জন্য সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, না জানিয়া তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না।

সুধাংশুকুমার গাড়ী হইতে নামিয়া যখন বাটীতে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি যেন প্রকৃতিস্থ নহেন; আহারে বসিয়া তিনি নুনে হাত দিতে দুধের বাটীতে হাত ডুবাইলেন, ঝোল ঢালিতে

পাতে জল ঢালিয়া বসিলেন; হেমাঙ্গিনী তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোমার কি হয়েছে?" অপ্রভিত হইয়া সুধাংশু-কুমার বলিলেন "তাইত!" হেমাঙ্গিনী তাঁহার জন্য পুনরায় ভাত বাড়িয়া আনিল, সুধাংশুকুমার কেবলমাত্র ভাত নাড়া চাড়া করিয়াই আহার শেষ করিলেন; তিনি কিছুই খাইতে পারিলেন না দেখিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, "তোমার নিশ্চয় কোন রকম অসুখ করেছে, শোবে চল, আজ যদি তুমি আবার সেই সব কাগজ পত্র নাড়া চাড়া কর, আমি সব পুড়িয়ে দেব. ওই কাগজ পত্র গুলো যেন আমার সতীন হয়েছে।" হেমাঙ্গিনীর কথা শুনিয়া সুধাংশু কুমার মনে মনে বলিলেন কাগজ পত্র সতীন না হইলেও তোমার প্রকৃত সতীন আছে; জানি না তুমি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? যাহা হউক তিনি পত্নীর কথা মত শয়ন করিলেন; হেমাঙ্গিনী তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, সুধাংশু তাহাকে আহার করিয়া আসিতে বলিলেন; কিন্তু হেমাঙ্গিনী বলিল, "তুমি ঘুমুলে তবে যাব।" অগত্যা সুধাংশু কুমার নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিদ্রার ভান করিয়া রহিলেন; স্বামীকে নিদ্রিত ভাবিয়া হেমাঙ্গিনী আহার করিতে গেল। সুধাংশু ভাবিতে লাগিলেন বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কি বলিবেন, কি বলিয়া তাহার নিকট মার্জ্জনা চাহিবেন, বিমলা কি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পরিবে? সে কি বিশ্বাস করিবে তিনি কখনই তাহাকে বিস্মৃত হন নাই; পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া বিমলা কি তাঁহাকে ঘৃণা করিবে? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল,

তিনি উৎসুক হইয়া বৈকালের জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনী আহার করিয়া আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

চারিটা বাজিতেই সুধাংশু কুমার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেই হেমাঙ্গিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে বলিল, "এখনও অনেক বেলা আছে; রৌদ্রের তেজ কমেনি আর একটু ঘুমোও বেলা পড়লে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেয়ো—আমিও সঙ্গে যাব!"

সু।—আমি আজ একবার রামদাস বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাব; তিনি পুরীতে এসেছেন, বিকেলে তাঁর বাসায় যাব বলেছি।

হে।—আর একটু বাদেই যাবে। এখনও বড্ড রুদ্দুর রয়েছে।

সু।—চারটে বেজে গেছে, হাত মুখ ধুয়ে কাপড় প'রে বেরুতে প্রায় পাঁচটা বেজে যাবে; তখন আর রৌদ্রের তেজ থাকবে না, তুমি মুরারিকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেও।

এই বলিয়া সুধাংশু কুমার বাহিরে আসিলেন এবং সত্বর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া কণিকা সুন্দরীর বাটীর দিকে গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কণিকা সুন্দরীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া সুধাংশুকুমার শুনিলেন রামদাস বাবু মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি সেইস্থানে যাইয়া রামদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামদাস বাবু তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, সুধাংশুবাবুও ইঞ্জিনীয়ার, তাহাতে রামদাস বাবুর সহপাঠী, সুতরাং রামদাস বাবু আগ্রহ করিয়া সুধাংশুকুমারকে মন্দিরের নক্সা ও গঠনাদি দেখাইলেন; সুধাংশুকুমার সেই সমস্ত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "অতি সুন্দর নক্সা হয়েছে, এ অপেক্ষা আর কিছু হতে পারে না, এতদিন মাটী পাথর কাটার কার্য্য করেও তুমি যে নক্সা আঁকার বিদ্যা ভোলনি এই আশ্চর্য্য।" রামদাস বাবু ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে নক্সা অঙ্কনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুধাংশুকুমারের এই প্রশংসায় রামদাস বাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সুধাংশুকুমারকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে আসিয়া অন্দরে সংবাদ দিলেন। অল্পক্ষণ পরে একজন দাসী আসিয়া বলিল, "মাসীমা আপনার নাম জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছেন।" সুধাশুকুমার বলিলেন, "নাম বললে চিনতে পারবেন না, তোমার মাসীমাকে বল হাজারীবাগের গণেশ বাবুর ছেলে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

দাসী আসিয়া বিমলাকে সেইকথা বলিতে, বিমলা ভাবিল তাহা হইলে ইনি বোধ হয় আমার দেবর হইবেন, সুতরাং দেখা করিতে আপত্তি করা ভাল দেখায় না; তথাপি বিমলা কণিকাকে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে কণিকা দাসীকে বলিল, "বাবুকে অন্দরে ডাকিয়া আন।" এই বলিয়া কণিকা গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দাসী সুধাংশু কুমারকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সুধাংশুকুমার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেই বিমলা দেখিল, প্রাতে সমুদ্রের ঘাটে যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল এ সেই, তিনি একটু অধিক করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া, দাসীকে বসিবার আসন দিতে বলিলেন। দাসী সুধাংশুকুমারের জন্য আসন প্রদান করিয়া বাহির হইয়া গেল। সুধাংশুকুমার আসন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তিনি কি বলিয়া বিমলাকে সম্ভাষণ করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু চুপ করিয়া থাকাও যুক্তি সঙ্গত নয়, বিমলা কি মনে করিবে? সুতরাং তিনি বলিলেন "আপনার প্রথম বিবাহের কথা মনে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন। বিমলা ভাবিল—এ কে? পাগল নয়ত, আমার প্রথম বিবাহের কথা কি? স্ত্রীলোকের আবার দুইবার তিনবার বিবাহ হয় নাকি? আমার দেবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু এ কে কে জানে? ঘাটে তখন আমার দিকে যেমন করিয়া চাহিয়াছিল এখনও সেই রকম করিয়া চাহিয়া আছে, এ লোক ভাল নয়, দেবরই হউক

আর যেই হউক, আমার এর সামনে আসা উচিত হয় নাই। ইতোমধ্যে সুধাংশুকুমার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনার অতি শৈশবেই বিবাহ হয়েছিল, আপনি কখন আমাদের বাটীতে আসেন নাই, নরেন্দ্র বাবুর সহিত বাবার বিবাদ হওয়ায় বাবা আপনাদের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পরে সুধাংশুবাবু—আপনাদের অনেক অনুসন্ধান করে-ছিলেন, কিন্তু আপনাদের কোন সংবাদ পান নাই; হঠাৎ রাম-দাসবাবুর নিকট আপনার পরিচয় পেয়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছি।" স্বামীর নাম শুনিয়া বিমলার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল; সে তাঁহাকে নিশ্চিতই দেবর স্থির করিয়া বলিল, "তোমার দাদা ভাল আছেন ত?" "দাদা!" সুধাংশু-কুমার চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাদা!" পরক্ষণেই মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তবে আপনার সন্ধান না পাওয়ায় তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন।"

"শুনেও সুখী হ'লাম, যে বিশ বৎসর পরে তাঁর মনে আমার জন্য একটু চিন্তারও উদয় হয়েছে। তোমার বউদিদি কেমন আছেন?"

"ভাল আছে।"

"তোমার দাদা এখন কোথায় আছেন?"

"পুরীতেই আছেন।"

"পুরীতে?"

"হাঁ।"

বিমলা ভাবিল; তিনি পুরীতে আছেন, তাহার সন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু তবু নিজে না আসিয়া ভ্রাতাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন! তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল—গ্রহণ না করুন, সে ত তাঁহার স্ত্রী, তিনি কি একবার তাহাকে দেখা দিয়াও যাইতে পারিলেন না! না পারুন, তিনি সুখে থাকুন—এই ভাবিয়া বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"তোমার দাদা কি তোমাকে আমার খোঁজে পাঠিয়েছেন?" সুধাংশুকুমার অনেক কষ্টে এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া ছিলেন; কিন্তু আর পারিলেন না, তিনি বিমলার প্রশ্নের উত্তরে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "না বিমলা আমি নিজেই এসেছি। বিমলা—বিমলা! আমি যে এই বিশবৎসরের মধ্যে একদিনও তোমায় বিস্মৃত হতে পারি নাই, তোমার মূর্ত্তি যে আমার হৃদয়ে সেই শৈশব হতে অঙ্কিত রয়েছে, সমুদ্রতীরে তোমাকে দেখিবা মাত্রই আমি তোমাকে আমার বিমলা বলিয়া চিন্‌তে পেরেছিলাম।" সুধাংশুকুমারের কথা শুনিয়া বিমলা যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তাহার চক্ষে জগৎ-সংসার যেন ঘুরিতে লাগিল, সে বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি—তুমি কে? তুমি কাকে কি ব'ল্‌ছো?"

"আমিই তোমার হতভাগ্য স্বামী সুধাংশু।—" থর থর করিয়া বিমলার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল, সে পড়িয়া যাইতেছিল, সুধাংশুকুমার ত্বরিতে তাহাকে দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, বিমলার সংজ্ঞাশূন্য দেহ

তাঁহার বক্ষের উপর ঢলিয়া পড়িল। সুধাংশুকুমার কাতর কণ্ঠে "বিমলা—বিমলা" বলিয়া বার বার ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না, তাঁহার অত্যন্ত ভয় হইল। এত দিন পরে যদি তিনি বিমলাকে প্রাপ্ত হইলেন, সে কি তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিল? তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তাহার নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বক্ষস্থলে হাত দিয়া দেখিলেন, বিমলার হৃদয় মৃদু মৃদু স্পন্দিত হইতেছে। তাঁহার ভরসা হইল বিমলা জীবিত আছে। তিনি ধীরে ধীরে বিমলার মুখখানি ধরিয়া তাঁহার মুখের নিকট আনিয়া প্রীতিভরে বার বার চুম্বন করিতে লাগি-লেন,—সে চুম্বনে বিমলার চেতনাহীন দেহে বিদ্যুৎ ছুটিল, তাহার মোহ কাটিয়া গেল; বুঝিল, সে সুধাংশুকুমারের বক্ষে—তাঁহারই ক্রোড়ে বসিয়া আছে, মনে মনে পরম পরিতৃপ্তি অনুভূত হইলেও তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল; সে উঠিতে গেল, কিন্তু সুধাংশুকুমার তাহাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বিমলা, আমি অপরাধী, আমাকে মার্জ্জনা কর, আমি এই বিশবৎসরের মধ্যে একদিনও তোমাকে ভুলিতে পারি নাই, কিন্তু পিতা জীবিত থাকিতে আমি তোমার অনুসন্ধান ক'রতেও পারি নাই; তাঁর নিষেধ ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে এই তিন বৎসর, আমি তোমার অনেক অনুসন্ধান করিছি, কিন্তু তোমার কোন সংবাদ পাই নাই; আজ সমুদ্র-স্নান ক'রতে গিয়ে তোমাকে দেখেই, আমি

চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম, তুমি শ্রীশবাবুর পত্নীর ভগিনী ; তবু আমার মন বিশ্বাস করতে চাহে নাই ; সে বলছিল—এ তোমার সেই বিমলা ! আমিও তাহা নিশ্চিত জানবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলাম, ভাগ্যক্রমে রামদাসের সহিত দেখা হওয়ায়, আমি তোমাকে আমার বিমলা বলিয়া নিশ্চিত জানতে পারলাম।”

বিমলা বিমুগ্ধ চিত্তে স্বামীর কথা শুনিতেছিল, সে তাহার চিরবাঞ্ছিত স্থানে—স্বামীর বক্ষে আশ্রয় পাইয়াছে ! সুধাংশু-কুমারের কথা শেষ হইলে সে আপনার মৃণালনিন্দিত কোমল বাহুবল্লী দ্বারা স্বামীকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “এ ত স্বপ্ন নয় ! সত্য সত্যই কি তুমি !—সত্যই কি অভাগিনীকে এতদিন পরে তোমার মনে পড়েছে ! না—এ স্বপ্ন ! যদি স্বপ্ন হয়, এ স্বপ্ন যেন আর না ভাঙ্গে—এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেন আমার মৃত্যু হয়, আমি আজীবন তোমার বিরহ সহ্য করিছি, এ স্বপ্নের মিলন—আমার সমস্ত জীবনের দুঃখের তুলনায়ও অধিক সুখের। এ স্বপ্ন যদি ভাঙ্গে সে দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব না—বল বল, এ কি স্বপ্ন—না সত্য ?”

“সত্য—সত্য বিমলা, এ স্বপ্ন নয়।” স্বামীর কথা শুনিয়া বিমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীকে পুনরায় তাহার যথাসাধ্য শক্তিতে জড়াইয়া ধরিল—কি জানি, যদি সে তাঁহাকে এতদিন পরে পাইয়া পুনরায় হারাইয়া ফেলে ! অনেকক্ষণ এইরূপ নীরবে

অবস্থান করিয়া বিমলা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কতদিন এখানে এসেছ ?"

"প্রায় পনের দিন হবে।"

"তুমি কি এখানে একা এসেছ ?"

"না।"

বিমলা বুঝিল, তাহার সপত্নীও এখানে আসিয়াছে; অজ্ঞাতে তাহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইল; সে ভাবিল, স্বামী তাহার একেলার নয়; সে ধীরে ধীরে স্বামীর ক্রোড় হইতে অবতরণ করিল। সপত্নীর কথা শুনিতে তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল, কিন্তু কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া পাইল না; সে নীরবে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল। সুধাংশুকুমার তাহার হস্ত দুইখানি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"বিমলা, তোমার একটি সপত্নী আছে।"

"শুনেছিলাম শ্বশুর তোমার পুনরায় বিয়ে দিয়েছিলেন।"

"সেই বিবাহের সময়ই আমি পিতাকে আমার পূর্ব্ব বিবাহের কথা বলায় তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন এবং আমাকে পূর্ব্ব বিবাহের কথা ভুলে যেতে আজ্ঞা করেছিলেন এবং তিনি যত দিন জীবিত থাকবেন, আমি যাতে কারও নিকট সে বিবাহের কথা প্রকাশ না করি, আমাকে সেইরূপ শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন পনের বৎসর, সেই বারই আমি এন্ট্রেন্স্ পাশ করি। আমার বিবাহ করবার ইচ্ছা ছিল না। পিতা অসন্তুষ্ট হবেন বলে বিবাহ করেছিলাম—কিন্তু আমি

যে দিন হাজারিবাগ থেকে পিতার সঙ্গে চলে আসি, তার পর হতে আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও আমার সেই শৈশব-সহচরীকে ভুলতে পারি নাই। তার সেই ক্ষুদ্র হাসি-মাখা মুখখানি মনে করে সময়ে সময়ে হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করতাম। পিতার মৃত্যুর পর অনেক অনুসন্ধান করেও তোমার উদ্দেশ পাই নাই; মনে করেছিলাম, এ জীবনে আর তোমার দেখা পাব না, ভগবান দয়া না করলে আমি তোমাকে পেতাম না।"

স্বামীর কথায় বিমলা অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিল; স্বামী যে তাহাকে বিস্মৃত হন নাই—তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, একথা শুনিয়া তাহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই আবার সপত্নীর কথা মনে পড়ায় তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে বলিল, "জ্ঞান হবার পরে আজ কত দিন—কত দিন পরে তোমাকে দেখতে পেলাম, তোমাকে যে আমি এ জীবনে দেখতে পাব, আমার সে আশাও ছিল না; কিন্তু—"

"কিন্তু কি বিমলা?"

"তুমি ত আমার—" বিমলার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সে বলিতে যাইতেছিল—তুমিত আমার নও, তুমি আমার সপত্নীর; কিন্তু তাহার মুখ হইতে সে কথা বাহির হইল না, সে নীরব হইয়া রহিল। সুধাংশুকুমার তাহার নীরবতার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বিমলা, আমি চিরদিনই তোমার।" বিমলা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া মনে মনে বলিল,—"আমার এই

পঁচিশ বছর বয়স হইল, আমার ভাগ্যে এর মধ্যে স্বামীর সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই, তিনি আমার সপত্নীর; সে তাঁহাকে ভালবাসে, তিনিও তাহাকে ভালবাসেন; আমি তাহার সুখের পথের কণ্টক হইব না; আমার সহ্য হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তবু—তবু——না—স্ত্রী-হৃদয় বড় দুর্ব্বল—বিমলার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। অনেক কষ্টে বিমলা চিত্তসংযম করিয়া বলিল, "আমার কথা বোধ হয়, তুমি ভিন্ন আর কেহই জানে না?" আর কেহই অর্থে সুধাংশুকুমার বুঝিলেন, বিমলার সপত্নী হেমাঙ্গিনী; তিনি বলিলেন, "না।"

"তবে আর কাহাকেও জানাইয়া আবশ্যক নাই। তুমি সুযোগ মত এক এক বার আমাকে দেখা দিয়া যাইও, আমি তাহাতেই তৃপ্ত থাকিব—ইহার অধিক আমি আর কিছুই চাহি না।" এই কথা বলিতে কিন্তু বিমলার নিতান্ত অনভিপ্রায়েও তাহার চক্ষু ফাটিয়া দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। সুধাংশুকুমার সস্নেহে নিজের উত্তরীয় দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তাহা হইবে না বিমলা, আমি বিশবৎসর পরে আজ তোমাকে পাইয়াছি, আমার সমস্ত জগৎ একদিকে—আর তুমি একদিকে; আমি আমার সর্ব্বস্ব, জগৎ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত কিন্তু আমি আর তোমাকে ছাড়িয়া থাকিব না—থাকিতে পারিব না।" সুধাংশুকুমারের কথায় বিমলার মনে কিরূপ আনন্দ হইল, তাহা স্বামিসোহাগিনী ভিন্ন অন্য কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা হইবে না, কিন্তু তথাপি বিমলা দৃঢ়স্বরে বলিল, "তাহা হইবে না, আমার ছোট

ভগিনীর মনে কষ্ট হইবে ; সে নির্দ্দোষী, আমি তাহার মনে কষ্ট দিতে পারিব না। আমার কথা সে জানে না, তাহাকে জানাইবার আবশ্যক নাই।”

সুধাংশুকুমার অনেক অনুনয় করিয়াও বিমলার সংকল্প শিথিল করিতে পারিলেন না ; অগত্যা তিনি আপাততঃ বিমলার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বিমলা মানবী নয় দেবী !

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রামেশ্বর বাবুকে আমরা পাহারাওয়ালার সহিত থানার দিকে গমন করিতে দেখিয়াছিলাম, এবং এতদিন তাঁহার কোন সংবাদ লই নাই বলিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইতে পারেন; সুতরাং আমরা এক্ষণে তাঁহার কথা আরম্ভ করিলাম। রামেশ্বর বাবু যখন পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক জবরদস্তীপূর্ব্বক থানায় আনীত হইলেন, তখন ইনস্পেক্টর বাবু বা জমাদার সাহেব কেহই থানায় ছিলেন না; সুতরাং রামেশ্বর বাবুকে তাঁহাদের আগমনের প্রতীক্ষায় থানায় বসিয়া থাকিতে হইল। বেলা দুইটার সময় জমাদার সাহেব তদন্ত হইতে ফিরিয়া আসিলে, রামেশ্বর বাবু তাঁহাকে সেলাম করিয়া পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক তাঁহার নির্য্যাতনের কথা নিবেদন করিলেন। জমাদার সাহেব আদ্যোপান্ত তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "হামারা আসামী ছোড় দেনেকা কুচ এক্তেয়ার নেহি হ্যায়, বড় বাবুকো আনে দেও, ছুটী হো যাগা।" অগত্যা রামেশ্বর বাবু বড় বাবুর অপেক্ষায় থানায় থাকিতে বাধ্য হইলেন। বেলা পাঁচটার সময় ইনস্পেক্টর বাবু ফিরিলেন। তিনি রামেশ্বর বাবুকে চিনিতেন, রামেশ্বর মুক্তি লাভ করিলেন।

অবিলম্বে একটি ঝাঁকা মুটে ডাকিয়া আনিয়া রামেশ্বর তাহার মস্তকে তাঁহার সেই যথাসর্ব্বস্ব ভাঙ্গা টিনের বাক্সটি চাপাইয়া দিয়া

তাহার সহিত থানা হইতে বহির্গত হইলেন। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, তাহাতেও কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সমস্ত দিন মৌতাত বন্ধ থাকায়, রামেশ্বরের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল ; মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার শরীরের সমস্ত গ্রন্থির যোড় খুলিয়া যাইতেছে, সুতরাং থানা হইতে অল্পদুর আসিয়াই তিনি ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং মুটিয়াকে দাঁড়াইতে বলিলেন। মুটিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া তাঁহাকে রাস্তার উপর বসিয়া পড়িতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, 'ক্যা হুয়া বাবু।"

রামেশ্বর বলিলেন, "চলনে নেই শক্তা।"

"গাড়ী বোলায়কে লায়েগা ?"

"নেহি নেহি—হাম্‌কো বাসা ঠিক করতে হোগা, তোম্ বাক্স নামাও আউর এই তিন আনা পয়সা লিয়ে, দৌড়কে বাজারে যাও, দো আনাকো আফিং আউর চার পয়সার বড় তামাকু লে আইয়ে,—বড় তামাকু পিতা তো ?"

"হাঁ হাঁ বাবু, মিল্‌নেসে পিতাহোঁ" বলিয়া, মুটিয়া বাক্সটি রামেশ্বরের পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া পয়সা লইয়া প্রস্থান করিল এবং অনতিবিলম্বে বাবুর মৌতাতের সরঞ্জাম লইয়া ফিরিয়া আসিল। রামেশ্বর অহিফেন হস্তে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অর্দ্ধেক আন্দাজ বদনে নিক্ষেপ করিলেন, বাকি অর্দ্ধেক পাকা খাইবেন বলিয়া পকেটে রাখিয়া দিলেন। মুটিয়া ততক্ষণ তাহার বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি তামাকের পাতা বাহির করিয়া বড় তামাকের যোগাড় করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই তামাক প্রস্তুত হইল, মুটিয়া

একটী নেকড়া জড়ান সরু লম্বা কলিকা রামেশ্বর বাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "পিজিয়ে বাবু।"

রামেশ্বর কলিকাটি হাতে লইয়া, বোধ হয়, ব্যোম ভোলা বলিয়া টান দিয়াছিলেন; নচেৎ কলিকা জ্বলিয়া উঠিবে কেন? যাহা হউক, পরে আর একটি ছোট টান দিয়া, কলিকাটি মুটিয়ার হস্তে প্রদান করিলেন, সে প্রসাদ গ্রহণ করিল। কাঁচা আফিং এর মৌতাত বিলম্বে হয়, রাস্তায় পাকার সুবিধা হইবে না, সেই জন্য রামেশ্বর বড় তামাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ব্যোম ভোলানাথের কৃপায় তাঁহার শরীর প্রকৃতিস্থ হইল, শিথিল গ্রন্থি-বন্ধন সকল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তিনি উঠিয়া মুটিয়াকে বলিলেন, "চল।"

মুটিয়া তখন কলিকা হইতে বড় তামাকের ভস্মাবশেষ ঝাড়িয়া ফেলিয়া কলিকাটি কাপড়ে বাঁধিতেছিল; সে বলিল, "কাহাঁ যাওগে বাবু?"

"একটা বাসা দেখ্‌নে হোগা।"

"হামলোগ যাহাঁ রয়তা উস বাড়ীমে একঠো খালি ঘর হ্যায়, লেকেন সে খোলার বাড়ী আছে।"

"কুছ পরোয়া নেই হুঁই চলো।

মুটিয়া রামেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাসাবাটীতে আনয়ন করিল, এবং বাড়ীওয়ালীকে ডাকিয়া, রামেশ্বর বাবুকে দেখাইয়া, ঘর-ভাড়ার কথা বলিল। কথাবার্ত্তা স্থির হইল, ঘরভাড়া মাসে দেড় টাকা দিতে হইবে, আর বিছানা ও তক্তাপোষ ব্যবহার করিলে

আর এক টাকা বেশী দিতে হইবে; রামেশ্বর মাসিক আড়াই টাকা ভাড়া দিতেই স্বীকৃত হইলেন।

রামেশ্বরের পিতা বৈদ্যনাথ বাবু কলিকাতায় গুপ্তবাবুদিগের বাটীতে কুড়ি টাকা মাহিয়ানায় বাজার-সরকারী কার্য্য করিতেন; বাবুদিগকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া দুটি ভাত ভিক্ষা করিয়া বৈদ্যনাথ পুত্রকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন; রামেশ্বরের বয়স তখন এগার বার বৎসর হইবে।

গুপ্তবাবুদিগের বড় বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বরের সমবয়স্ক ছিলেন, তাঁহার সহিত রামেশ্বরের বিশেষ সৌহার্দ্য হইল, অর্থাৎ রামেশ্বর ছোট বড়-বাবুর নানা রূপে মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন; এই বয়সেই তাঁহাকে পাকা মোসাহেব বলিয়া প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ছোট বড়-বাবুর খাতিরে বাটীর ভৃত্য, দাসী এবং দরোয়ানবর্গও রামেশ্বরের খাতির করিতে লাগিল। রামেশ্বর মনে মনে তখন ছোট বড়-বাবুর সহিত নিজের তুলনায় আপনাকে একমাত্র অর্থে তাঁহার সমতুল্য নয়, তদ্ভিন্ন আর কোন পার্থক্যই দেখিতে পাইত না। ছোট বড়-বাবু কুস্তি লড়িতেন, রামেশ্বরও তাঁহার সহিত কুস্তি লড়িত; তাহার শরীরে একটু ক্ষমতাও ছিল, সে ক্রমে একজন ছোটখাট পালোয়ান হইয়া উঠিল। মারামারি দাঙ্গাহাঙ্গামায় সে ছোট বড়-বাবুর দক্ষিণ হস্ত, সুতরাং তাহার প্রতাপে কি বাটীস্থ কি পল্লীস্থ সকলেই সন্ত্রস্ত।

বৈদ্যনাথ, যে অভিপ্রায়ে রামেশ্বরকে কলিকাতায় আনয়ন

করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না, চেষ্টায় আশানুরূপ ফল না হইয়া বিপরীত ফল হইল। চেষ্টায় ফল না হইলে, লোকে নিয়তি বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দেয়—নিয়তি প্রকৃতির নামান্তর মাত্র—প্রকৃতি-বশে জগতের সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়—প্রকৃতি-বশেই চেষ্টায় সুফল বা বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। সেই জন্যই বোধ হয়, বৈদ্যনাথ তাঁহার আশানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইলেন না। যাহাই হউক, গুপ্তবাবু-দিগের ছোট বড়-বাবু জীবিত থাকিলে, রামেশ্বরের দিন বোধ হয় স্বচ্ছন্দে কটিয়া যাইত, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ গুপ্তবাবু-দগের ছোট বড়-বাবু বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া জগতের মায়া-বন্ধন ছেদন করিয়া পরলোক গমন করিলেন। রামেশ্বরের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, রামেশ্বর তিন বৎসর পূর্ব্বে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া সরস্বতীর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সরস্বতীর আনুগত্য অপেক্ষা গুপ্তবাবুদিগের ছোট বড়-বাবুর আনুগত্যই তাঁহার অধিক লাভের বিবেচনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সে স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য হইল না। ছোট বড়-বাবুর মৃত্যুর পরে, বৈদ্যনাথ বাবু-দিগকে ধরিয়া তাঁহাদের সওদাগরী আফিষে একটি পনের টাকা মাহিয়ানার চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে চাকরী তাঁহার পছন্দ হইল না, চাকরী করাই তাঁহার অনভিমত; তিনি চাকরী করিবেন না। বৈদ্যনাথ অনেক বুঝাইলেন কিন্তু রামেশ্বর সম্মত হইলেন না—তাহার কারণ রামেশ্বর ছোট বড়-বাবুর সহিত কয়েকদিন থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন, অভিনয় দেখিয়া তাঁহার মনে নাটক লিখিবার একান্ত বাসনা হইয়াছিল; তিনি নাটক

লিখিবেন, কিন্তু এতদিন চিন্তা করিয়াও তাঁহার সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, এক্ষণে অনেক চিন্তা করিয়া তিনি সেক্সপীয়রের নাটকের গল্পগুলি পড়িয়া লইবার জন্য এক খানি ল্যাম্ব্‌ স্‌টেল ক্রয় করিয়া আনিলেন, এবং অনেক কষ্ট করিয়া সেখানির পাঠশেষ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার নাট্য-কলাবিদ্যার কিছু মাত্র বিকাশ হইল না। তিনি না জানেন ইংরাজী, না জানেন বাঙ্গলা, না জানেন সংস্কৃত, কিন্তু নাটক লিখিতে হইবে। অনেক চিন্তা করিয়া তিনি আট আনা খরচ করিয়া ডিক্‌স্ এডি-সনের এক খানি সেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং তাহার মধ্যে Much a do about nothing নামক নাটকখানির মস্তক ভক্ষণ করিয়া "মিথ্যা জাঁক" নামে নাটক রচনা করিলেন। কিম্বদন্তী, তিনি সেই পুস্তকখানি গিরিশ বাবুর নিকট থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য দিয়াছিলেন এবং গিরিশবাবু নাকি রামেশ্বরের পুস্তকের প্রথম দুই পংক্তি পাঠ করিয়াই রামেশ্বরের অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তিনি রামেশ্বরকে পুস্তকখানি ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেন এবং স্বহস্তে রামেশ্বরকে লিখিয়াছিলেন, সেক্সপীয়ারের নাটকের এরূপ অনুবাদ তাঁহার—শুধু তাঁহার নহে—সর্ব্বসাধারণের স্বপ্নেরও অগোচর—আর বাঙ্গলা থিয়েটারে এরূপ নাটকের অভিনয় হওয়া অসম্ভব বলিয়া তিনি ইহা অনুতপ্ত চিত্তে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

শুধু এই উপসর্গ হইলে বৈদ্যনাথ বাবু, পিতৃপুরুষের সহিত চরিতার্থ হইতেন কিন্তু ছোট বড়-বাবুর মোসাহেবের কোন বিষয়েই

আমোদের ত্রুটি ছিল না। ছোট বড়-বাবুর সহিত বেড়াইয়া তাঁহার অনেক বড়-বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায়ই রামেশ্বরকে তাঁহাদের বডিগার্ডরূপে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, সুতরাং রামেশ্বরের বিনা খরচায় অবাধ পানাহারের প্রায় কোন ব্যতিক্রম হইত না।

শ্রীশচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার পরে গেঁড়াতলা দিয়া আসিতেছিলেন, একটি বদমাস গুণ্ডা তাঁহার নিকট হইতে ঘড়ি ও ঘড়ির চেন কাড়িয়া লয়। ঘটনাক্রমে উহা রামেশ্বরের চক্ষে পড়ায় রামেশ্বর শার্দ্দুল-বিক্রমে গুণ্ডাকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে ভূপাতিত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ঘড়ি ও ঘড়ির চেন লইয়া শ্রীশবাবুকে প্রত্যর্পণ করেন। শ্রীশচন্দ্র কৃতজ্ঞ চিত্তে রামেশ্বরের হস্তে এক খানি কার্ড দিয়া বলিলেন—আপনাকে শুধু ধন্যবাদ দিয়া তৃপ্তি হইতেছে না, যদি কখন আবশ্যক হয় এবং আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, এই কার্ডে লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। শ্রীশচন্দ্রকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই, তিন মাসের মধ্যেই এক দিন একজন পাহারাওয়ালা, তাঁহার হস্তে রামেশ্বরকে প্রদত্ত কার্ড-খানি আনিয়া দিল। কার্ডে লেখা ছিল—"আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, দয়া করিয়া একবার আসিবেন—গেঁড়াতলার সেই অপরিচিত।"

দাঙ্গা করিয়া রামেশ্বর ধৃত হইয়াছিলেন, বৈদ্যনাথ তখন রোগশয্যায়, অগত্যা রামেশ্বর শ্রীশবাবুর শরণ লইলেন। শ্রীশবাবু

অনেক টাকা খরচ করিয়া তাহাকে কারাদণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহার পাঁচ শত টাকা জরিমানা হইল, সুতরাং জরিমানার টাকাও শ্রীশবাবুকে দিতে হইল। সে যাত্রা রামেশ্বর বাঁচিয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে এক দিন রামেশ্বর গলায় কাচা বাঁধিয়া আসিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট পিতৃদায় জানাইল; শ্রীশচন্দ্র তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। শ্রাদ্ধান্তে রামেশ্বর আসিয়া শ্রীশচন্দ্রকে বলিল, বাবা মারা যাওয়ায় তাহাদের বড়ই দুরবস্থা হইয়াছে, পরিবারবর্গকে সে দেশে রাখিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার থাকিবার স্থান নাই, শ্রীশবাবু যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে দিনকতকের জন্য বাটীতে স্থান দেন, বড়ই উপকৃত হয়। শ্রীশচন্দ্র সম্মত হইলেন, রামেশ্বর তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইল। মোসাহেবী করিয়া রামেশ্বর গুপ্তবাবুদিগের ছোট বড়-বাবুকে বশ করিয়াছিল, শ্রীশবাবুর প্রতিও রামেশ্বর সে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু সে অস্ত্র এখানে বিফল হইল—বিফলই বা কেমন করিয়া বলি, রামেশ্বরের আমোদ ও স্ফূর্ত্তির সুবিধা হইল না বটে, যেহেতু শ্রীশচন্দ্র নিতান্ত স্ত্রৈণ এবং অরসিক, আমোদ স্ফূর্ত্তি কাহাকে বলে জানেন না—কিন্তু রামেশ্বরের আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা এবং সময়ে অসময়ে দু-দশ টাকা প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইত না। আমোদ স্ফূর্ত্তি তাঁহার বাহিরেই চলিত। ক্রমে ভাটার টানে জল শুকাইয়া উঠিলে রামেশ্বর ডাঙ্গায় উঠিলেন, কিন্তু সুযোগ পাইলে তিনি জলে নামিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

অবশেষে এমন অবস্থা হইল যে, জলস্থল দুইটি না হইলে আর তাঁহার চলিত না। শ্রীশবাবুর শ্বশুর মহাশয় তাহাকে বাটীতে রাখিতে শ্রীশচন্দ্রকে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীশচন্দ্র সে নিষেধ পালন করেন নাই, রামেশ্বর তাঁহার বাটীতেই ছিল।

আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে রামেশ্বর কোন কারণে একদিন শ্রীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কণিকা-সুন্দরী তখন পিত্রালয়ে সেই গৃহে রামেশ্বর কণিকাসুন্দরীর চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইল; পাপীর লুব্ধমনে পাপ চিন্তার উদয় হইল; সে কণিকাসুন্দরীকে লাভ করিবার জন্য মনে মনে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার কোন কল্পনাই কার্য্যে পরিণত হইবার মত এতিয়া বিবেচিত হইল না; নিষ্ফল চিন্তায় ক্রমে তাহার মনে কণিকার প্রতি ঘৃণা ও বিরাগের উদয় হইতে লাগিল। সে মনে মনে কণিকার সর্ব্বনাশ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। যাদৃশী ভাবনা যস্য। সুযোগও উপস্থিত হইল, কণিকাসুন্দরী মোহিতকুমারকে বাড়ীতে রাখিবার জন্য শ্রীশচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন; শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?" মোহিত আসিল। মোহিতের আগমনে, রামেশ্বর যে সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইল; মোহিতের সহিত কণিকাসুন্দরী অসঙ্কোচে কথা কয়, দুইজনে হাসি তামাসা চলে, শ্রীশবাবু প্রায় গৃহে থাকেন না; ইহাতেও যদি কণিকার সর্ব্বনাশ না হয়, তাহার অদৃষ্টের জোর বলিতে হইবে।

কণিকা যেদিন শ্রীশচন্দ্রের পত্রে অবগত হইল তিনি সাবিত্রীব্রতের দিন বাটী আসিবেন, ব্রতের দুইদিন পূর্ব্বে আসিতে পারিবেন না, এ সংবাদ রামেশ্বরের অগোচর রহিল না; রামেশ্বর উপযুক্ত সময় উপস্থিত বুঝিয়া সেই দিনই শ্রীশচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন; পত্রের কথা সকলেই অবগত আছেন। রামেশ্বর রামমণির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি করিতে কি হইল, কণিকার সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া যে আমার সর্ব্বনাশ হইল, আশ্রয় হারাইলাম, আমার এ কুবুদ্ধি কেন হইল? কিন্তু শ্রীশবাবুর আজ্ঞায় সে গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়াছে কি না কোন মতে তাহার স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রশান্ত মহাসাগরে বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একটি সুবৃহৎ দ্বীপ—সেই দ্বীপে কেবলমাত্র ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, কেবল ইক্ষুক্ষেত্র; মধ্যে মধ্যে ধূমকেতুর মত কুলী-পল্লী উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যোমচক্র-পারে বিস্তৃত ইক্ষু ক্ষেত্রের নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করিতেছে। বেলা হইতে বেলান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত্র। দ্বীপের বন্দর বা সহর, তাহার পশ্চিম ভাগে একটি স্বভাবনির্ম্মিত বালুকা-ডকের উপর অবস্থিত; ডকে অনেকগুলি জাহাজ সর্ব্বদাই নোঙর করিয়া আছে; অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা; ডকের উপরে বড় বড় গুদাম ঘর; গুদামের মধ্যে স্তূপীকৃত বস্তাবন্দী চিনি; অসংখ্য লোক প্রাতঃ-কাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সেই চিনির বস্তা মাথায় করিয়া নৌকায় তুলিয়া দিতেছে; নৌকা সেই সমস্ত বস্তা লইয়া জাহাজের পার্শ্বে যাইতেছে; নৌকা হইতে কপিকলে সেই সমস্ত বস্তা জাহাজে উঠিতেছে। গুদাম-ঘরগুলি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেই বড় বড় ইঞ্জিন ঘর; সেখানে দিনরাত্রি বড় বড় ইঞ্জিন চলিতেছে, ইঞ্জিন-ঘরের পশ্চাতে চিনি প্রস্তুতের ভাঁটা, তাহার পশ্চাতে ইক্ষু মাড়াই করিবার প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণ হইতে ভাঁটা পর্য্যন্ত পাকা নালা, প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্পেষিত

ইক্ষুরস সেই নালা দিয়া গড়াইয়া আসিয়া ভাঁটায় পড়িতেছে, এবং সেইরস হইতেই চিনি প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের দেশে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয় না, কিন্তু রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে খরচা অল্প ও চিনির পরিমাণ অধিক হয়। এই প্রাঙ্গণের পশ্চাতে কুলী-পল্লী, এই কুলীপল্লী ছাড়াইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ অগ্রসর হইলেই দ্বীপের সহর—সহরে কিন্তু বাজার নাই—ইহা ইক্ষু বণিকগণের আবাসস্থান। সহরটি পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ একহারা অর্থাৎ একটি প্রশস্ত রাজপথের একপার্শ্বে অবস্থিত; চতুর্দ্দিকে উদ্যান, পুষ্পোদ্যান, শাক সবজীর ক্ষেত্রপরিবেষ্টিত বড় বড় বাঙ্গলো—অনেক গুলি বাঙ্গলো—এই বাঙ্গালোগুলিই এখানকার সহর; এখানে ইক্ষু বণিকেরা বাস করেন। কেবল মাত্র একখানি বাঙ্গলো ডকের উত্তর পার্শ্বে একেবারে সমুদ্রের উপরে অবস্থিত। সহর ছাড়াইয়া অল্পদূর অগ্রসর হইলেই দ্বীপের বাজার; এখানে দ্বীপের ব্যবসায়িগণ বাস করেন; ইহার পশ্চাতে রেলওয়ে ষ্টেশন, থানা, হস্পিটাল এবং জেলখানা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং সহরটি একহারা, পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত; সহরের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক দিয়া দুইটি রেলের লাইন ইক্ষু মাড়াই প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ষ্টেশন হইতে তিনটি রেল পথ দ্বীপটিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে; গাড়ী রাত্রি-দিন চলিতেছে, কিন্তু গাড়ীর আরোহী ইক্ষু এবং কুলীর রসদ; এই তিনটি রেলপথ হইতে আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতরেল পথ বাহির হইয়া সমস্ত দ্বীপটিকে লৌহবর্ম্মে মণ্ডিত করিয়াছে।

অসংখ্য কুলী হাতগাড়ী ঠেলিয়া ক্ষেত্র হইতে ইক্ষু লইয়া রেলগাড়ীতে বোঝাই দিতেছে, ইক্ষুর বীজ রেলগাড়ী হইতে ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছে, আবার কতকগুলি গাড়ী রেলগাড়ী হইতে রসদ লইয়া গিয়া পল্লীতে পল্লীতে গুদাম ঘরে বোঝাই করিতেছে; এই গুদাম হইতেই কুলীদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। সহস্র সহস্র একর জমীতে ইক্ষুর আবাদ হইতেছে; সহস্র সহস্র কুলী সেই স্থানে কার্য্য করিতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত কুলীই ভারতবর্ষের; অধিকাংশ, নাগপুর, ছোটনাগপুর ও মধ্য প্রদেশের—সাঁওতাল খৃষ্টান; তবে অন্যান্য নীচজাতীয় হিন্দুও আছে, মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। সকলেই চুক্তিবদ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছে, চুক্তি অনুযায়ী ইহাদিগকে পাঁচ বৎসর ইক্ষু-বণিকদিগের অধীনে কার্য্য করিতে হইবে। রাজার চক্ষে ধূলি দিয়া ইক্ষু বণিকগণ এই কুলিদিগকে ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করেন; ইহাদিগকে ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করান, অল্প মজুরী দেন; মজুরীতে তাহাদের অন্ন-বস্ত্র ব্যতীত আর বিশেষ কোন অভাব হয় না —উপরির মধ্যে মেটের চাবুক ও ওভারসিয়ারের পদাঘাত, এবং বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত কার্য্য। তাহার পরে ন্যায্য মূল্যের দেড়গুণ দুইগুণ দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্ত দ্রব্যই এই বণিকদিগের নিকট হইতেই কিনিয়া লইতে হয়; ফল কথা, তাহারা শরীরের রক্ত-মাংস দিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা হইতে তাহাদিগকে কোন মতে

জীবনধারণের উপযোগী বৎ কিঞ্চিৎ দিয়া বণিকেরা সমস্তই গ্রাস করিয়া থাকেন। তাহারা চুক্তি বদ্ধ—অর্থাৎ একেবারে বিক্রীত না হইয়া পাঁচবৎসরের জন্য বিক্রীত—পাঁচ বৎসরের জন্য তাহারা বণিকদিগের ক্রীতদাস! তাহার পরে অর্থাৎ এই পাঁচ বৎসর এইরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ করিয়া যে সৌভাগ্যবানগণ জীবিত থাকে, তাহারা মুক্তির সময় নিরন্ন ও প্রায় নগ্ন; তাহারা মুক্তি লইয়া কি করিবে? তাহাদের জঠর-জ্বালা কেমন করিয়া নিবৃত্তি করিবে, কেমন করিয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইবে? সুতরাং চুক্তিবদ্ধ হইয়া তাহারা যে কার্য্য করিতে আসিয়াছিল, চুক্তি মুক্ত হইয়াও তাহারা সেই কার্য্য করিতে বাধ্য হয়; তাহাদের অন্য উপায় নাই—উপায় থাকে না। পাঁচ বৎসরের জন্য কার্য্য করিতে আসিয়া তাহারা আজীবন সেই কার্য্য করিয়া থাকে।

উইলবার'ফোর্স প্রভৃতি কতিপয় সহৃদয় ইংরাজ মহাত্মগণের আন্তরিক চেষ্টায় যখন ক্রীতদাস ব্যবসায় উঠিয়া যায়, বণিকেরা প্রমাদ গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই কুলী-আইনের চক্রে বণিকেরা সেই ব্যবসাই বলবান রাখিয়াছিলেন। আফ্রিকা হইতে নিগ্রো কুলীর ব্যবসা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু এই কুলী আইনের বলে ভারত গভর্ণমেণ্টের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বণিকেরা সেই ব্যবসাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া, ঐ সমস্ত স্থানে কমিশন প্রেরণ করেন; তাহার ফলে এক্ষণে বণিকদিগের অত্যাচার অনেক অল্প হইয়াছে।

ডকের উত্তর পার্শ্বে সমুদ্রের উপর যে বাঙ্গলোখানির কথা বলিয়াছি, সেই বাঙ্গলোয় এক্ষণে ষ্টুয়ার্টচন্দ্রদিগের কর্ত্তা মিঃ চন্দ্র বাস করেন; ইহার পূর্ব্বে এখানে ষ্টুয়ার্ট সাহেব থাকিতেন; সম্প্রতি তিনি মিঃ চন্দ্রকে তাঁহার কারবারের অংশ বিক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছেন। দ্বীপের মধ্যে এই ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বণিক; প্রতিমাসে ইঁহাদের লক্ষ লক্ষ মণ চিনি দেশবিদেশে রপ্তানী হয়, দ্বীপের প্রায় অর্দ্ধাংশের ইঁহারাই একমাত্র অধিকারী; ন্যূন কল্পে দশ সহস্র কুলী ইঁহাদের কার্য্য করিয়া থাকে; তাহাদের সকলেরই অবস্থা ভাল, আরও আহ্লাদের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে ইঁহাদের আবাদে আদৌ চুক্তি-বদ্ধ কুলী নাই।

সাতবৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রাতঃকালে মেল ষ্টীমার হইতে একজন খাস ইংরাজ সাহেব আর একজন বাঙ্গালী সাহেব এই ইক্ষু-দ্বীপে অবতরণ করেন। ইঁহারাই ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানি; তখন এখানে রেলওয়ে ছিল না, কিন্তু সে সময়েও এই ইক্ষুদ্বীপে সাত আট জন বণিক ইক্ষুর চাষ করাইতেন, তবে তাঁহারা বন্দর হইতে অধিক দূরে ইক্ষু-ক্ষেত্র করিতে সাহস করিতেন না; এজন্য দ্বীপের মধ্যভাগ হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জমীই অনাবাদী অবস্থায় পতিত ছিল। পশ্চিম ভাগের সমস্ত জমিই উক্ত আট জন ইক্ষু বণিকের, কিন্তু তাঁহাদের জমির অর্দ্ধাংশও আবাদ হইত না; প্রতি বৎসর অল্প অল্প করিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা আবাদী জমি বাড়াইয়া লইতেন; এইরূপে, কয়েক বৎসরে

তাঁহারা তাঁহাদের অধিকৃত জমির অর্দ্ধাংশ আন্দাজ উঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট-চন্দ্র আসিয়া অতি অল্প খাজনায় দ্বীপের সমগ্র পূর্ব্বাংশ জমা করিয়া লইলেন; দ্বীপনিবাসী বণিকেরা তাঁহাদিগকে উন্মাদগ্রস্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদের ভ্রমাপনোদন হইল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, নিজেদের বুদ্ধির দোষে তাঁহারা সমস্ত দ্বীপটিই আপনাদের অধিকারে গ্রহণ করেন নাই। ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানী, ইক্ষু চাষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের আবাদ হইতে বন্দর পর্য্যন্ত লাইট রেল বসাইতে আরম্ভ করিলেন। রোপিত ইক্ষু চিনিপ্রস্তুতের উপযোগী হইবার সময়ের মধ্যেই তাঁহাদের রেললাইনের কার্য্য শেষ হইয়া গেল; তাঁহারা রেলে করিয়া বন্দরে চিনি আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহারা সমস্ত দ্বীপ ব্যাপিয়া রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন; এবং ইক্ষু-দ্বীপের পূর্ব্ব-বণিকগণও এক্ষণে তাঁহাদের সমস্ত জমিতে আবাদ আরম্ভ করিলেন। ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর ইক্ষুর আবাদের উপর আবার রেলওয়ে হইতেও প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল।

দুই বৎসর পরে জনসন সাহেব নামে একজন ইক্ষু বণিক হঠাৎ টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার দূর আত্মীয় ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত অভিজাত-শ্রেষ্ঠ ডিউক অফ উইন্চেষ্টারের মৃত্যু হওয়ায় তিনি উইন্চেষ্টারের ডিউক হইয়াছেন; এক বৎসরের মধ্যে মৃত ডিউক ও তাঁহার মধ্যে যে কয়জন উত্তরাধীকারীর ব্যবধান ছিল সকলেই যেন জনসনের ডিউক্‌ডম প্রাপ্তির পথ নিষ্কণ্টক করিবার

জন্য, পরামর্শ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং জনসন সাহেব—এক্ষণে ডিউক অফ উইন্‌চেষ্টার—তাঁহার ইক্ষুর আবাদ, কারখানা, বাঙ্গলো প্রভৃতি সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিলেন। ষ্টুয়ার্ট চন্দ্র কোম্পানী জনসন সাহেবের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইলেন; এই সময় হইতে ষ্টুয়ার্ট সাহেব জনসন সাহেবের বাঙ্গলোয় বাস করিতেন। আরও দুই বৎসর পরে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের একমাত্র পুত্র আর্থার রবার্ট ষ্টুয়ার্ট বুয়র যুদ্ধে নিহত হওয়ায়, ষ্টুয়ার্ট সাহেব স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন; এই সাত বৎসরে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর মধ্যে তাঁহার অর্দ্ধাংশ মিঃ চন্দ্রকেই বিক্রয় করিলেন। দ্বীপস্থ অন্যান্য বণিকদিগেরও ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর এই অংশ ক্রয় করিবার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার অংশীদার মিঃ চন্দ্রকেই তাঁহার অংশ বিক্রয় করেন, মিঃ চন্দ্রও তাঁহাকে তাহার সম্পত্তির ন্যায্য মূল্যের উপরেও তিন লক্ষ টাকা অধিক দিয়াছিলেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব ইংলণ্ডে প্রস্থান করিবার পরে মিঃ চন্দ্র জনসন সাহেবের বাঙ্গলোয় তাঁহার নিজের বাসস্থান স্থির করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে আগমন করেন। বাঙ্গলোখানি অতি সুন্দর—ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল—চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় দশ একর জমির মধ্যস্থলে অবস্থিত, বেলা-ভূমির উপান্ত দেশ হইতে সারি সারি ঝাউ বৃক্ষ, সেলাইন

বায়ু অবরোধ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক নিয়মে এরূপ সুশৃঙ্খলায় রোপিত যে, সমুদ্র হইতে বা বন্দর হইতে বাঙ্গলোর দ্বিতল গৃহ ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না; সমুদ্র-তীর হইতে একটি প্রকাণ্ড ঝাউবন অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঙ্গলো খানিকে বেষ্টন করিয়া যেন বক্ষস্থলে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। দূর হইতে দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, যেন বৃক্ষশিরে একটি সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে; বাঙ্গলোর প্রাচীর-গাত্র হইতে সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র ফিটের অধিক এই ঝাউবন বিস্তৃত ছিল।

দশ একর পরিমিত ভূমির মধ্যস্থলে বাঙ্গলো, বাঙ্গলোর পশ্চাতে রন্ধন-শালা, ভৃত্যদিগের বাস-গৃহ ও পশুশালা; এখানে গরু, ছাগ, মেষ প্রভৃতি পশু, হংস পারাবত ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী ও রসনা-তৃপ্তিকর সামুদ্রিক পক্ষীও রক্ষিত হয়; তাহার পশ্চাতে ফলের উদ্যান। জনসন সাহেব ভারতবর্ষ, সিংহল, সিঙ্গাপুর, জাভা, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ হইতে উত্তম উত্তম সুস্বাদু ফলের গাছ আনয়ন করিয়া এখানে রোপণ করিয়াছিলেন। প্রাচীরপার্শ্বে চারিদিকে নারিকেল, তাল, সুপারী, কোকো প্রভৃতি বৃক্ষের সারি; সমস্ত বৃক্ষই এক্ষণে ফলবান হইয়াছে। বাঙ্গলোর সম্মুখ হইতে প্রাচীরের গেট পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পের উদ্যান; বার মাসই এই পুষ্পোদ্যানে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া নাসিকা ও নয়নের তৃপ্তিদান করে। পুষ্পোদ্যানের পরে দুই দিকেই শাক-সবজীর ক্ষেত্র; সেখানে সময়োপযোগী নানাবিধ শাক-সবজী সর্ব্ব সময়েই আবশ্যকেরও অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গলো-

খানির নাম প্যারাডাইজ ভিলা—বাস্তবিকই ইহার নাম করণ সার্থক হইয়াছে; ভ্রমণকারিগণ এই দ্বীপে আগমন করিলে, এ বাঙ্গলো না দেখিয়া কেহই প্রত্যাবৃত্ত হন না। জনসন ও ষ্টুয়ার্ট সাহেবের আমলে পশুশালায় নানা প্রকার শূকর, মুরগী, পেরু প্রভৃতি জন্তু ছিল, কিন্তু মিঃ চন্দ্র সেগুলি অন্য বণিক সাহেবদিগকে বিলাইয়া দিয়াছেন।

প্যারাডাইজ ভিলার দ্বিতলের বারান্দায় একখানি কোচের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ষ্টুয়ার্ট চন্দ্র কোম্পানীর কর্ত্তা মিঃ চন্দ্র সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছেন। সমস্ত দিন অবিরত পরিশ্রমের পরে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে যেন সমুদ্রগর্ভে তাঁহার বিশ্রাম-স্থানে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, ক্রমে নীলাম্বুরাশি ও নীলাম্বরের সন্ধিস্থলে তাঁহার বিশ্রামাগারের প্রবেশ-দ্বারের নিকট আগমন করিয়াই তিনি যেন তাঁহার কার্য্যালয়ের মণ্ডলাকার বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় আকার ধারণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন। সমুদ্রের দিক হইতে নানা জাতীয় পক্ষীও তাঁহার দেখাদেখি স্ব স্ব নীড়াভিমুখে দ্বীপের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিল; মিঃ চন্দ্র কিন্তু সে সব কিছুই দেখিতেছিলেন না। সন্ধ্যা-সুন্দরীর সে মনোলোভা শোভনা বেশ তাঁহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই; সে দৃষ্টি নীলাম্বু ও নীলাম্বরের মিলন-আলিঙ্গন ভেদ করিয়া, দূরে—বহু দূরে—ধাবিত হইয়াছিল। অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া নানা দেশ অতিক্রম করিয়া সে দৃষ্টি কোথায় কাহার সন্ধানে যাইতেছে? সে একখানি মুখ সহস্র যোজন অন্তর হইতে

একখানি মুখ, তাঁহার সে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাই তাঁহার দৃষ্টি তাহার উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে—শুধু আজ নহে, এই সাত বৎসর ধরিয়া সেই মুখখানি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত দেখিতে পাইলেই এইরূপ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে; তাহার সে আকর্ষণ শক্তিকে তিনি কোন মতেই প্রতিরোধ করিতে পারেন না! সেই মুখখানি—সেই মুখখানি বিস্মৃত হইবার জন্য তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নামের প্রথমার্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মুখখানির দেশের সহিত অনন্ত সমুদ্রের ব্যবধান দিয়াছিলেন—কিন্তু সেই মুখ তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে দেয় নাই—সেই মুখের চিন্তা তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করে নাই—সেই মুখখানি তিনি ভুলিতে পারেন নাই—ভুলিতে পারিবেন না। সেই মুখখানি যে তাঁহার জগতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল—ছিল কি এখনও আছে; কিন্তু সেই সুন্দর মুখের অন্তর কি কুৎসিত!—তাঁহার জীবনের সুখ স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপিও তিনি সেই মুখখানির কথা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না!—একবার ভালবাসিলে বুঝি আর কখন বিস্মৃত হওয়া যায় না। পাঠক ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর মিঃ চন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনিই আমাদের সেই দেশত্যাগী শ্রীশচন্দ্র।

নৈশ অন্ধকারে ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইল। নীলাম্বরে এক দুই করিয়া সংখ্যাহীন নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিল; নীরব প্রকৃতির বক্ষে সমুদ্র-কল্লোল যেন শ্রীশচন্দ্রের কর্ণে আর্ত্তের কাতর ক্রন্দন বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল; তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমস্তই বৃথা; জীবন অনন্ত যন্ত্রণাময়—জীবনে সুখ নাই; দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা-পূর্ণ তিক্ত জীবনের প্রয়োজন কি? এতদিনেও তিনি কণিকাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, এখনও তিনি তাহাকে আন্তরিক ভালবাসেন! শ্রীশচন্দ্র আপনার দুর্ব্বলতায় অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। এই দ্বীপের হতভাগ্য চুক্তিবদ্ধ কুলীগণও তাঁহার অপেক্ষা সুখী, তাঁহার অপেক্ষা ভাগ্যবান; তাহাদিগের অতি দুঃখের জীবন হইলেও, তাহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিতেছে, শারীরিক সুখভোগের অধিকারী না হইলেও তাহাদের হৃদয় মন অনন্ত যন্ত্রণা-পীড়িত নয়। অর্থে জগতের সুখ নির্ভর করে—জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকে এইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছে; অর্থ মানব জীবনে কণামাত্রও সুখ প্রদান করিতে পারে না—বিন্দুমাত্রও হৃদয়-বেদনার যন্ত্রণা লাঘব করিতে পারে না; অধিকন্তু অর্থ জগতের অনর্থ বৃদ্ধির এক মাত্র কারণ; অর্থ জগতের দুঃখ যন্ত্রণার প্রসার বৃদ্ধি করে—অতৃপ্ত লালসার অনলে ইন্ধন নিক্ষেপ করে; না—অর্থে সুখ নাই, জীবনে সুখ নাই, বোধ হয় জীবিত না থাকাই এক মাত্র সুখ; আর যদি জীবিত থাকিতে হয়—বৃক্ষ হও, প্রস্তর হও কিংবা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ধূলিকণা হও—নিরন্তর পদদলিত হইলেও যাহা হইতে রক্ত বাহির হইবে না। হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় শ্রীশচন্দ্রের অশ্রু তাঁহার দৃষ্টিশক্তি রোধ করিয়া গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নূতন নহে; এই সাত বৎসরের মধ্যে কত দিন যে তিনি এই

রূপ চিন্তা করিয়াছেন, তাহার নির্ণয় হয় না। চিন্তায় কোন ফল নাই, চিন্তায় ঘটনাস্রোত রোধ হয় না, অতীত, পরিবর্ত্তিত হয় না, কিংবা ভবিষ্যৎকে ইচ্ছানুরূপ গঠন করা যায় না; জানিয়াও চিন্তা করিতে বিরত হইতে পারেন না; দুঃখ করিয়া দুঃখের লাঘব হয় না; কিন্তু দুঃখ করিব না বলিয়া মন বুঝাইতে পারেন না। মানবের মন বড় দুর্ব্বল! এ দুর্ব্বলতা কেন? ইচ্ছা করিয়া লোকে এ দুঃখ ভোগ করে কেন? দুঃখ ভোগ করিয়াছে—দুঃখ ভোগ করিতেছে,—দুঃখ ভোগ করিতে হইবে জানে—তথাপিও যেন মানব সেই দুঃখ ভোগের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না কেন? এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও আমি কণিকাকে ভুলিতে পারি না কেন? তাহার জন্য আমার জীবনের সকল সুখের অবসান হইয়া গিয়াছে; তাহার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, জন্মভূমির মায়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি—তথাপি তাহার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারি না কেন? এ 'কেন'র উত্তর শ্রীশচন্দ্র খুঁজিয়া পাইলেন না।

শ্রীশচন্দ্র পি ও কোম্পানীর ডবলিন নামক জাহাজে "এস্ চন্দ্র" নামে কেবিন রিজার্ভ করিয়াছিলেন, এইজন্য শশিশেখরবাবু কলম্বো পোর্টে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহার কোন সংবাদ পান নাই। তিনি প্রথমে অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রেলিয়া হইতে কালিফর্ণিয়া এবং সেখান হইতে কানাডায় গমন করেন, এই স্থানেই ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; ষ্টুয়ার্ট সাহেব কথায় কথায় শ্রীশচন্দ্রের নিকট ইক্ষুর আবাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে

ইক্ষুর আবাদোপযোগী একটি দ্বীপের কথা বলিয়া বলেন, যদিও বন্দরের নিকটস্থ দ্বীপের পূর্ব্বভাগ বণিকেরা অধিকার করিয়াছেন, দ্বীপের পশ্চিমাংশ অতি অল্প খাজনায় লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেস্থান হইতে বন্দর পর্য্যন্ত চিনি আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন, সমস্ত দ্বীপটিই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, চিনির জন্য ইক্ষু-আবাদের উপযোগী আরও অনেক স্থান তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই দ্বীপটি ইক্ষু-আবাদের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, অন্য কোন স্থান তেমন নহে, কিন্তু সেখানে ইক্ষুর আবাদ করিতে হইলে বন্দর পর্য্যন্ত রেল বসাইতে না পারিলে কোন ফল হয় না। ইক্ষুর আবাদ ও রেলপথ প্রস্তুত দুই কার্য্যের মূলধন তাঁহার নাই, সেইজন্য তিনি একজন অংশীদার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু কোন ধনীই তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সাহস করেন না—অবশ্য কার্য্যটি নিতান্ত সহজ নহে—ইহাতে অজস্র অর্থ এবং পরিশ্রম ব্যয় করিতে পারিলে সুবিধা হইবার পনের আনা সম্ভাবনা আছে, নতুবা মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, সম্ভবতঃ এই কারণেই কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহেন না। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের নিকট সকল কথা শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুই কার্য্যের জন্য কত মূলধন আবশ্যক হইতে পারে?" উত্তরে ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড—অর্থাৎ সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হইলে উভয় কার্য্য সুচারুরূপে চালান যাইতে পারে।" ইক্ষুর আবাদের জন্য ত্রিশ হাজার পাউণ্ড এবং রেলওয়ের জন্য বিশ হাজার

পাউণ্ড, কিন্তু তাঁহার ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের অধিক মূলধন নাই।

শ্রীশচন্দ্র ভাবিলেন, দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অস্থির চিত্ত শান্ত হইবে না, প্রশান্ত সাগরের এই দ্বীপে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, হয়ত তিনি তাঁহার দারুণ দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন; নিতান্তই যদি তাহা না হয় অন্ততঃ পক্ষে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে, তিনি কতক সময়ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। যদি কার্য্যে ক্ষতি হয়? হইবে—তাহাতে তাঁহার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না এ সামান্য অর্থক্ষতিতে তাঁহার কি হইবে? তিনি ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে বলিলেন, "আমি ত্রিশ হাজার পাউণ্ড দিয়া আপনার সহিত এই কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

"সত্য?"

"হাঁ, মিথ্যা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

"ভগবানকে ধন্যবাদ। মিঃ চন্দ্র, আমরা—শুধু আমরা কেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতিই বাঙ্গালী জাতিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সাহস করিয়া কোন কার্য্যেই অগ্রসর হইতে চাহেন না বলিয়া তাঁহাদিগের জাতীয় উন্নতি পরিস্ফুট হইতে পায় না; নতুবা আপনাদের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যদি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তাঁহারা সহজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারেন।"

শ্রীশচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনার কথার সত্য, শীঘ্রই প্রতিপন্ন হইতে দেখা যাইবে।"

কানাডার ষ্টুয়ার্টচন্দ্র নামে তাঁহাদের কোম্পানী গঠিত হইল। শ্রীশচন্দ্র যখন কণিকার নামে তাঁহার ব্যাঙ্কের হিসাব পরিবর্ত্তিত করিবার আদেশ দেন, সেই সময়ে এস্ চন্দ্রের নামে তিনি বম্বে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে দশ লক্ষ টাকা রাখিয়াছিলেন; তিনি কানাডা হইতে বম্বে ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে কানাডার অষ্ট্রেলিয়ান্ ব্যাঙ্কে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা, ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর নামে জমা দিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। কতিপয় দিবসের মধ্যে তাঁহাদের আইনানুযায়ী সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল, তাঁহারা ইক্ষুদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া তাঁহারা প্রথমে দ্বীপের সমগ্র পতিত জমিই বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন, পরে ষ্টুয়াট সাহেব ইক্ষুর চাষে ও শ্রীশচন্দ্র রেলওয়ে নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ষ্টুয়াট সাহেবের কথা সত্য হইয়াছে;—আজ শ্রীশচন্দ্র ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর একমাত্র মালিক এবং ইক্ষুদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক।

ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীকেও প্রথমে দাদন দিয়া কুলী সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য ইক্ষু-বণিকদিগের কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ না করিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন পথ অবলম্বন করিলেন। কুলীদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া, বিনা লাভে তাহাদের রসদ-পত্র সরবরাহ করিয়া, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই ইক্ষুদ্বীপে 'সোণার মনিব' হইয়া উঠিলেন; বিশেষতঃ তাঁহাদিগের রসদের গুদামে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য থাকিত না, সুতরাং ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদিগের কুলীরা তাহাদের উপার্জ্জনের অর্থ, অনর্থ-পানে ব্যয় করিতে পারিত

না। বন্দরের সহর হইতে কয়েকবার কয়েক ব্যক্তি ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর আবাদে গরলের দোকান খুলিয়াছিল, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট সাহেব নিজে দাড়াইয়া থাকিয়া, তাহাদের সমস্ত দ্রব্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; সেই হইতে ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর আবাদে এ ব্যাধি প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রামেশ্বর বাবুকে আমরা মুটিয়ার বাড়ীওয়ালীর বাটীতে আড়াই টাকায় সতক্তা-বিছানা ঘর ভাড়া লইতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। বাড়ীওয়ালীর নাম রামমণি—যৌবনে রামমণি যে নিতান্ত কুৎসিতা ছিল না, তাহা তাহার এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও বেশ বুঝিতে পারা যায়। গৃহস্থ-কন্যা পদস্খলিত হইয়া গৃহত্যাগ করে, পরে ভাগ্যচক্রের নানা প্রকার আবর্ত্তনে, বিবিধ প্রকারে হাবুডুবু খাইয়া রামমণি এখন কূলে উঠিয়াছে; খোলার বাটিখানি তাহার নিজস্ব সম্পত্তি, ঘর ভাড়া দিয়া সেই অর্থেই তাহার কায়ক্লেশে দিন গুজরাণ হইতে পারে; ইহার উপরে আবার একজন অভিভাবক আছে—অভিভাবক কুলী-চালানী কার্য্য করেন—ভারতের কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বরেণবাবু সেই স্থানে গমন করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পরিবারবর্গের সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন। তাহাদিগকে টাকা দেখান ও টাকা পাইবার জন্য নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পাতা, ঘাস, বৃক্ষমূল প্রথমে সিদ্ধ করিয়া, পরে কাঁচা খাইয়া—সিদ্ধ করিবার জন্য বিলম্ব সহ্য করিতে না পারায়—যাহারা কোনমতে নশ্বর প্রাণকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া দেহে রক্ষা করিতেছে, তাহারা টাকা দেখিত না—তাহারা সেই টাকায় যে চাউল—যাহার মুখ আজ তাহারা সাতদিন দেখিতে পায় নাই—জঠর-যন্ত্রণায়

যাহারা কাঁচা ঘাস-পাতা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে—পাওয়া যাইতে পারে তাহার চিন্তা করিত, সেই চাউল দেখিত—তাহার পরে বরেন-বাবু তাহাদিগকে বলিতেন, তিনি তাহাদিগকে এমন স্থানে পাঠাইয়া দিতে পারেন যে, সেখানে যাইয়া পাঁচ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া আসিলে, তাহাদিগের চিরজীবনের দারিদ্র্য ও দুঃখ দূর হইয়া যাইবে, সকলেই বড়লোক হইয়া ফিরিয়া আসিবে। বুভুক্ষুগণ তখন সদাশয় বড়লোকের কথা স্মরণ করিয়া, আর শুধু অন্নে তৃপ্ত হইত না, তখন সেই অন্নের সহিত নানাপ্রকার রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য সম্মুখে উপস্থিত দেখিত, এবং কল্পনায় তাহার আস্বাদ অনুভব করিত—কিন্তু সেই কাল্পনিক আহারে জঠরানল যেন ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিত—বরেনবাবু অমনি সে স্থানের বর্ণনা আরম্ভ করিতেন —সে দেশে শুধু আখের চাষ হয়। জিনিস-পত্র খুব সস্তা, মাছ কিনিয়া খাইতে হয় না, ভাটার সময় সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়াইলে ইচ্ছামত মাছ কুড়াইয়া লইয়া আসিতে পারা যায়; চাউল, দাল, আটা, ময়দা, তৈল, ঘৃত কোন দ্রব্যই কিনিয়া খাইতে হয় না। থালা, ঘটি, কাপড়, জামা কিছুই কিনিতে হয় না, সমস্তই উপরি পাওনা, তাহার উপর আবার প্রত্যেকের নগদ মজুরী প্রতি হপ্তায় সাত টাকা! হতভাগ্যগণ এই সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া, সকলেই "আমি যাব বাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত। তখন বরেন-বাবু বলিতেন, "তিনি তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন কিন্তু সেখানে যাইতে অনেক টাকা খরচ, প্রায় দুই তিন শত টাকা। বরেনবাবুর এই কথা শুনিয়া সকলেই হতাশের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া

নীরব হইত,—তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ মুখ একেবারে শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া যাইত। বরেনবাবুও তাহাদের দুঃখে কাতরভাব প্রকাশ করিয়া চিন্তিতভাবে বলিতেন, "আমি বোধ হয়, তোমাদের সেখানে যাইবার খরচের টাকা যোগাড় করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগকে সেখানে যাইয়া পাঁচ বৎসর কাল কার্য্য করিব, এইরূপ চুক্তি-পত্র লিখিয়া দিতে হইবে; পাঁচ বৎসর তোমরা সেখানে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না; যিনি এই টাকা দিবেন, পাঁচ বৎসর তোমাদিগকে তাঁহারই কার্য্য করিতে হইবে। যদি স্বীকার হও—তোমরা প্রত্যেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং কাপড়, কোর্ত্তা, ঘটি, থালা এবং কম্বল পাইবে; তোমাদের ইচ্ছা হয়, বায়না লইতে পার।" জঠর-জ্বালায় সকলেরই সেস্থানে যাইতে অভিলাষ হইত, বরেনবাবু তাহাদিগকে দুই টাকা হিসাবে বায়না দিতেন, এবং পরদিবস লেখাপড়া করিয়া বাকি টাকা দিবেন বলিয়া বিদায় দিতেন।

বায়নার টাকা গ্রহণ করিয়া সকলেই গৃহে যাইয়া উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিত, আহারান্তে পূর্ণ উদরে, বিদেশে যাইবার কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু সেখানে যাইয়া যে আর অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হইবে না, এই চিন্তায় মন বাঁধিত; তথাপি বাপ-পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া যাইতে তাহাদের মন সরিত না, অনেকে পিছাইয়া যাইত, কিন্তু অনেকে প্রলুব্ধ হইয়া বরেনবাবুর জালে পতিত হইত।

সাওঁতাল বা অন্যান্য জাতি—যাহারা স্ত্রী-পুরুষে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহারা স্ত্রী-পুরুষে পুত্র-কন্যা লইয়া যাইত।

সাধারণের চক্ষে ধূলি দিয়া, আইন বাঁচাইয়া, গভর্ণমেণ্টকে প্রতারিত করিয়া এই সব লোক সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাদিগকে প্রাদেশিক ম্যাজিষ্ট্রেটের বা কমিশনারের নিকট লইয়া গিয়া চুক্তি-পত্রে বদ্ধ করা হইত, তাহারা রাজপুরুষদিগের প্রশ্নে স্বইচ্ছায় দেশ ছাড়িয়া গমন করিতেছে বলিয়া উত্তর দিয়া, চিরজীবনের জন্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত। কেহ অস্বীকৃত হইলে তাহাকে দাদনের বা বায়নার টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্য রাজপ্রতিনিধি আদেশ করিতেন; যে টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিত, সে মুক্তি পাইত; যে পারিত না, আইনের বিচারে রাজপ্রতিনিধি তাহাকে চুক্তি-পত্রে বাধ্য করিতে বাধ্য হইতেন; কারণ সে যখন টাকা লইয়াছে, হয় তাহাকে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে, নচেৎ তাহাকে পাঁচ বৎসরের জন্য সেই বণিকের কার্য্য করিতে হইবে—ইহা আইনের বিচার। যাহারা স্ব-ইচ্ছায় যাইতেছে, তাহাদের ত কথাই নাই।

প্রথম প্রথম বরেনবাবুর এই ব্যবসারে বিশেষ লাভ হইয়াছিল, কিন্তু পর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে কোনও ব্যক্তিই তাঁহার কথামত বড়লোক হইয়া বিদেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায়, এক্ষণে তাঁহার ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দা চলিতেছিল। তিনি কুলী-রপ্তানী করিবার যত এফিডেবিট করাইতে পারিবেন, জন-প্রতি পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। এই হৃদয়হীন পিশাচের ব্যবসারে, তিনি প্রচুর টাকা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার যাহা আয় হইত, তাহাই ব্যয় হইয়া যাইত; অথচ তিনি একক; বর্ত্তমানে আমাদের শ্রীমতী রামমণি বাড়ীওয়ালীর

সহিত তাঁহার ঘরকন্না হইয়াছিল। তিনি যখন বাহির হইতে কুলী সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আসিতেন, রামমণির বাটীতেই অবস্থান করিতেন। কলিকাতাতেও তাঁহার ব্যবসায় না চলিত, এমন নহে; তবে আজকাল তাঁহার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। তিনিও দ্বিতল হইতে নিম্নতল, নিম্নতল হইতে খোলাতলে রামমণির করতলস্থ হইয়াছেন।

রামেশ্বর বাবু রামমণির বাটীতে অধিষ্ঠান হইবার কতিপয় মাস পরে, একদিন ছোট নাগপুরের কয়েকটি স্ত্রীপুরুষ আসিয়া তাহার দুইখানি খালি ঘরে বাসা লইল। তাহারা চাঁদপুর হইতে বাটী ফিরিয়া যাইতেছে, কালীঘাটে ৺কালী দর্শন করিতে যাইবে বলিয়া দুই দিন কলিকাতায় থাকিবে। বরেন্দ্রবাবু তাহাদের পরিচয়ে জানিলেন, তাহাদিগের বাটী সিংভূম জেলায়, তাহারা জাতিতে মাহাতো, উহারা স্ত্রীপুরুষে কার্য্য করে। চাঁদপুরে হরিমোহন কুণ্ডুর চিনির আড়তে ইহারা কর্ম্ম করিত, কয়েক বৎসর বৈদেশিক চিনির আমদানীতে দেশীয় চিনির ব্যবসায় ক্রমশ: বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। গত বৎসর কোনরূপে কারখানা চলিয়াছিল, এবারে একেবারে বন্ধ, শুধু বন্ধ কেন, উঠিয়া গিয়াছে। লক্ষপতি হরিমোহন কুণ্ডু আজ পথের ভিখারী। চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ ঋণ করিয়া করিয়া হরিমোহনবাবু কারখানা বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, চিনির বাজার আবার উঠিবে কিন্তু বাজার উঠিল না, দ্বৈপচিনির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুধু হরিমোহন বাবু নহেন, ভারতীয় চিনি-ব্যবসায়ী-মাত্রেরই সর্ব্বনাশ হইল। কুলিদিগেরও কার্য্য ফুরাইল। দেশে কাজ মিলে না, কিন্তু

বিদেশে থাকিয়াই বা কি করিবে, তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদিগের নিকট সকল কথা শুনিয়া বরেনবাবু বলিলেন, "বটে! তোমরা চিনির কাজ জান! আমি তোমাদিগকে খুব ভাল জায়গায় চিনির কায করিয়া দিব, তোমরা ৺কালী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলে, আমি তোমাদিগকে সব খবর বলিয়া দিব। যদি তোমরা সেখানে যাইতে চাও, আমি সে ব্যবস্থাও করিয়া দিব, তোমাদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে।"

রামেশ্বর শ্রীশচন্দ্রের বাটীতে থাকিবার সময়ে নানা উপায়ে যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়াছিল; বর্ত্তমানে তাঁহার দুই মাসের ঘরভাড়া বাকী পড়িয়াছে। উদরান্নের সংস্থান না করিতে পারিলেও মৌতাত আবশ্যক। গলায় উপবীত পরিধান করিয়া, গঙ্গার ঘাটে হাত পাতিয়া অদ্যকার মৌতাতের যোগাড় হইয়াছে, কাল কি হইবে, রামেশ্বর তাহার গৃহের সম্মুখস্থ দাওয়ার উপর একখানি চৌকিতে বসিয়া, তামাক টানিতে টানিতে সেই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে বরেন-বাবু কালীঘাট হইতে প্রত্যাবৃত্ত সিংভূম-বাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রামমণির গৃহের সম্মুখে একখানি মাদুর দিয়া তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন এবং বরেনবাবু নিজে তাহাদের নিকট একখানি চৌকিতে বসিয়া, তাহাদিগকে বিদেশের সেই কর্ম্ম-স্থানের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। মাহাতোগণ তাঁহার বর্ণনায় অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহাদের সেইস্থানে কর্ম্ম করিতে যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হইল, তাহারা সেইস্থানে তাহাদিগকে

পাঠাইয়া দিবার জন্য বরেনবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল ; বরেণবাবুও সম্মত হইলেন।

রামেশ্বরও নিজ গৃহের দাওয়ায় বসিয়া, বরেণবাবুর কথা শুনিতেছিল এবং দাদনের টাকা, বিনা খরচে সেখানে যাওয়া, নগদ মজুরীও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায় প্রভৃতি শুনিল ; তাহার মনেও চিনির কার্য্য করিবার জন্য সেই দেশে গমন করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু কায়িক পরিশ্রমের ভয়ে সে পশ্চাৎপদ হইতেছিল। যাহাতোগণ বরেনবাবুর নিকট হইতে আপনাদিগের গৃহে প্রস্থান করিলে, রামেশ্বর বরেনবাবুর নিকট আসিয়া বলিল—

"সে দেশে আমাদের কোন কাজকর্ম্মের সুবিধা হইতে পারে ?"

"কেন পারবে না, সাহস করে যে যেতে পারবে, তারই সুবিধা হবে ; পাঁচ বছরের মধ্যে বড়লোক হ'য়ে ফিরে আসতে পারবে।"

"কিন্তু আমাদের মত লোকে ত আর চিনির কার্য্য করিতে পারিবে না ?"

"কত রকম কাজ আছে, চিনির কাজ করিতে না পারেন, লোক খাটাইতে পারেন ত ?"

"লোক খাটাতে পারবো না কেন, সে ত আর পরিশ্রমের কাজ নয় !"

"তাই হলেই যথেষ্ট,—আপনাদের মত লোক পেলে সাহেবেরা লুফে নেবে।"

"আচ্ছা, আমি বিবেচনা করে দেখি।"

"আপনার যদি যেতে ইচ্ছা হয়, আমাকে বলবেন, আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব।"

রামেশ্বর একবার মনে করিলেন, তাঁহার সেই স্থানে যাওয়াই মঙ্গল, এখানে আর চলে না; কিন্তু লোক খাটাইবার কার্য্য না দিয়া সাহেব যদি তাহাকে কুলীর কার্য্য দেয়, এই ভয়ে ইচ্ছা থাকিলেও রামেশ্বর পশ্চাৎপদ হইলেন। পর দিবস রামেশ্বর পুনরায় গঙ্গার ঘাটে মৌতাত সংগ্রহ করিবার জন্ত ভিক্ষার্থ গমন করিলেন; কিন্তু ঘাটে কয়েকটি পর পর পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আজ তাহাকে রিক্ত হস্তে ফিরিতে হইল। পূর্ব্বদিন আহার হয় নাই, তিনি যে হোটেলে আহার করিতেন, সে একজন উৎকল-বাসীর; কোন ভদ্রলোকের সহিত উড়িষ্যা হইতে তাঁহার পাচক হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, এক্ষণে হোটেল করিয়াছে; রামেশ্বর কয়েকদিন হোটেলের পয়সা দিতে না পারায় পূর্ব্বদিন উৎকলবাসী তাঁহাকে "সড়া বঙ্গড় বপর ঘর পাউছন্তি" ইত্যাদি নানা-বিধ সুমিষ্ট কিস্কিন্ধ্যার বাক্যে তাঁহার জঠর-গহ্বর না হউক, কর্ণকুহর শীতল করিয়া বিদায় দিয়াছিল। ক্ষুধার যাতনায় যত না হউক, মৌতাতের অভাবে রামেশ্বরের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল; তিনি নাচার হইয়া বাসায় ফিরিলেন; মাহাতোগণ সেই সময়ে চুক্তিপত্র সহি করিয়া বরেনবাবুর নিকট হইতে বায়না লইতেছিল। পরদিবস এফি-ডেবিট করিয়া আসিলেই তাহারা বায়নার দরুণ বাকী টাকা এবং বস্ত্র-কম্বলাদি সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইবে। টাকা দেখিয়া রামেশ্বরের খোঁয়ারী অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল এবং সময় পাইয়া জঠরও নিতান্ত অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তোপায় রামেশ্বর অগত্যা বরেনবাবুর শরণ লইলেন; মাহাতোগণ প্রস্থান করিলে, তিনি বরেনবাবুর নিকট

আসিয়া বলিলেন, "বরেনবাবু আমি ওখানে যাব।" রামমণির নিকট বরেনবাবু রামেশ্বরের অবস্থা অবগত হইয়া তাহাকেও শিকারের মধ্যে গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র যে এ শিকার ধরা পড়িবে, আশা করেন নাই ; সুতরাং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "বেশ ত, বেশ ত, আপনার যাহাতে সেখানে কোনরূপ কায়িক পরিশ্রম না করিতে হয়, সাহেবকে বলিয়া আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" রামেশ্বর চুক্তিপত্রে সহি করিয়া দাদন গ্রহণ করিলেন। বরেনবাবুর পরামর্শে তিনি নাম ও জাতি পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি যদি স্বনামে কুলী হইয়া যান, তাঁহার আত্মীয় স্বজন যদি জানিতে পারে, বড়ই অপমান। রামেশ্বরও সেইরূপ বুঝিলেন। আসল কথা, তাঁহাকে স্বনামে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের সন্দেহ হইতে পারে এবং তাঁহার প্রশ্নে হয়ত নানা কথা প্রকাশ পাইতে পারে। রামেশ্বরের নাম হইল সুরন্তরাম, পিতার নাম বৈদ্যনাথের পরিবর্ত্তে বৈজুনাথ হইল। এই নামেই রামেশ্বর পর দিবস ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেবিট করিয়া স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাইতেছেন বলিয়া, নূতন জীবন-যাত্রা সাব্যস্ত করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুধাংশুকুমারকে বিদায় দিয়া বিমলার দৃঢ়তা ভাঙ্গিয়া গেল; সে আর একাকিনী থাকিতে পারিল না, দ্রুতপদে কণিকার নিকট ছুটিয়া গেল; কণিকাসুন্দরী তখন শয়ন-গৃহে শয্যায় শয়ন করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে গৃহ-প্রাচীরের দিকে চাহিয়াছিলেন, দ্রুত পদশব্দে ফিরিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিমলা; তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল, কিন্তু নয়ন অশ্রু-পরিপূর্ণ। বিমলা ছুটিয়া আসিয়া কণিকার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিল; পরে অশ্রু-সিক্ত মুখখানি তুলিয়া কণিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, দেখা পেয়েছি"—আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, হৃদয়-আবেগ নয়ন পথে গলিয়া নির্গত হইতে লাগিল। কণিকা বুঝিলেন, দিদি স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বিমলার অশ্রু দেখিয়া তাঁহারও চক্ষতে জল আসিল, তিনি অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, "তবে কাঁদচো কেন দিদি?" বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কাঁদচি কেন! দিদি, কাঁদবার জন্যই আমার জন্ম, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত স্বামীর জন্য অন্তরে কেঁদেছি, কখনও চক্ষের জল ফেলিতে পাই নাই, তোমার মত আমারও চক্ষে জল ছিল না দিদি, কিন্তু আজ আমার শুষ্ক হৃদয়ে বাণ ডাকিয়াছে দিদি, এ জল রোধ করিবার শক্তি আমার নাই। স্বামীকে ভালবাসিতাম, হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই ভালবাসে—বিবাহের পর হইতে স্বামীকে তাহার আপনার ভাবে, তাই ভালবাসে;

আমিও ভালবাসিতাম, কিন্তু আমি কখনও স্বামিসুখ পাই নাই। আমি এখন বুঝতে পেরেছি, আমার আজীবনের কষ্ট তোমার কষ্টের তুলনায় তুচ্ছ! আমি যে কষ্ট ভোগ করিয়াছি, তাহা কতকটা সহ্য করা যায়, তুমি সত্যই বলিয়াছিলে, 'আমি পাই নাই, তুমি পেয়ে হারিয়েছো'। আমি তখন তোমার ও আমার দুঃখের প্রভেদ বুঝিতে পারি নাই,এখন বুঝতে পেরেছি আমার দুঃখের সঙ্গে তোমার দুঃখের আকাশ-পাতাল প্রভেদ! কিন্তু দিদি,—আমি পেয়েও পেলাম না।" বলিয়া বিমলা তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি পুনরায় কণিকার বক্ষঃস্থলে লুকাইল।

কণিকা বিমলার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কেন—কেন দিদি! তিনি কি তোমাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত?" বিমলা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিল। কণিকা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে?"

"তিনি সতীনের; সতীন আমার কথা জানে না। তাহার মনে কষ্ট হইবে—তাঁহাকে সতীনকে দিয়াছি।"

"তুমি ত সতীনের কথা জানিতে।"

"জানিতাম।"

"তবে?"

"তুমি বুঝতে পারবে না দিদি, সতীন স্বামীকে ভালবাসে, সে আমার কথা জানে না—আমি মনকে বুঝিয়েছি, স্বামী সতীনের—সতীনের দোষ কি? সে ত স্বামীকে আমার পরিত্যাগ করতে বলেনি, জানতে পারলে হয়ত সেই আমাকে নিয়ে যেতে আসবে,

কন্তু তার মনে যে কষ্ট হবে, সে ত আমি নিজের মনে বুঝ্‌তে পারছি—নির্দ্দোষকে আর কেন যন্ত্রণা দেব,—পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল এ জন্মে ভোগ করে আসছি, আর সতীনের মন্নি কুড়োবো না।”

“কিন্তু তিনিত তোমারও স্বামী!”

“তিনি স্বামী—দেবতা—তিনি যাহা ইচ্ছা করতে পারেন—তিনি আমাকে কোনমতে পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত নহেন কিন্তু আমি—”

“ছি দিদি, তুমি অভিমান করে এ কার্য্য করেছ।”

“অভিমান নয় দিদি, সে কি, আমি তা বল্‌তে পারি নে; কিন্তু সে বড় ভয়ানক—তফাতে আছি বেশ আছি, কিন্তু চক্ষের সামনে—না দিদি, আমার এ স্ত্রী-হৃদয়—পুরুষের হৃদয়ের মত প্রশস্ত ও উদার নহে—বড় সংকীর্ণ, বড় স্বার্থপর—ভাগের ভালবাসায় আমার এ স্বার্থপর নীচ হৃদয় তৃপ্ত হবে না—তাই স্বামী সতীনকে দিয়েছি।”

“তুমি পাষাণী!”

“আমার হৃদয়ের ব্যথা তুমি বুঝ্‌তে পারবে না, আমার অপেক্ষা তোমার দুঃখ গুরুতর হ’লেও, তোমার মনে এক শান্তি আছে, তোমার স্বামী তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসতেন, এখনও বাসেন; তাই প্রথমে তোমার প্রতি সন্দেহে—পরে প্রত্যয়ে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে—তিনি তোমার প্রতি রুষ্ট না হয়ে আপনাকে তোমার সুখের পথের কণ্টক মনে করে, দেশত্যাগ করে চলে গিয়েছেন—তিনি যদি সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন, ভগবানের চিন্তা করতে গেলে আগে তোমার চিন্তা তাঁর মনে উদয় হবে। তোমার মনে পাপ নেই, তুমি স্বামি-পূজা করে, তোমার প্রতি

স্বামীর সন্দেহ জন্মাবার যে সুযোগ দিয়েছিলে, সেই পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছ—কিন্তু আমার স্বামী ত আমার নন।"

কণিকা মনে মনে আপনার সতীন কল্পনা করিয়া দেখিল—স্বামী যদি সতীন লইয়া ফিরিয়া আসেন, তাহার আনন্দ হইবে—কিন্তু সে আনন্দ যেন কেমন আনন্দ অথচ যেন কেমন আনন্দ নয়—তাহার পরে চক্ষের উপর স্বামীর সতীনকে—না না তাহা তাহার সহ্য হইবে না ; স্বামী ফিরিয়া আসুন, সতীনকে লইয়া সুখে থাকুন, সে তাঁহাকে সুখী মনে করিয়া সুখী হইতে পারিবে—কিন্তু সতীনের সহিত সে একসঙ্গে বাস করিতে পারিবে না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কণিকা ব'লিল, "ঠিক বলেছ দিদি, সতীনের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় না—কিন্তু অনেকে ত সতীনের সঙ্গে একসঙ্গে ঘরকন্না করে—তারা কেমন করে সংসার করে ?"

"ভগবান জানেন !"

দুইজনে গলাগলি হইয়া নীরবে শয়ন করিয়া রহিল। বিমলা ভাবিতে লাগিল স্বামীর স্পর্শ, স্বামীর ক্রোড়, স্বামীর চুম্বন কত সুখের ! এ সুখ ত সে কখন কল্পনাতেও অনুমান করিতে পারে নাই ! ভাগ্যবতী রমণীরা এই সুখ ভোগ করিয়া থাকে, সে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবতী ; সে আজীবন এই সুখে বঞ্চিত ছিল, এখন সে এতকাল পরে স্বামীকে প্রাপ্ত হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত ! স্বামি-সুখের কথা স্মরণ করিয়া, বিমলা কল্পনায় যেন পুনরায় সেই সুখ উপভোগ করিল। বিমলার স্মৃতি সুখের ; কিন্তু কণিকার স্মৃতি ? শ্রীশচন্দ্রের স্মৃতি কি সুখের ? না, কণিকা বা শ্রীশচন্দ্রের স্মৃতি

কখনই সুখের নহে। মনোবিজ্ঞানবিদেরা বলেন, স্মৃতি সুখের ; তাহার কারণ, বোধ হয়, দুঃখের স্মৃতিতে মনে দুঃখের উদয় হয় না ; কিন্তু সুখের স্মৃতিতে মনে কাল্পনিক সুখ অনুভব হয়। কিন্তু স্মৃতি কেবল সুখের নয় ; স্মৃতি যেমন সুখের, তেমনই দুঃখের ; জগতে নিরবচ্ছিন্ন কিছুই থাকিতে পারে না। স্মৃতি অতীত জীবনের সুখ-দুঃখে গঠিত ; একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইবে। কণিকা মানস-চক্ষে স্বামীকে দর্শন করিতেছিল ;—স্বামী তাহাকে কোন্ দিন কিরূপ কথা বলিয়াছিলেন, কোন্ দিন স্বামীর নিকট হইতে সে কিরূপ আদর পাইয়াছিল, কোন্ দিন স্বামী তাহাকে ভৎ'সনা করিয়াছিলেন, বিবাহের পরে প্রথম স্বামিসাক্ষাৎ হইতে শ্রীশচন্দ্রের শেষ বিদায় পর্য্যন্ত সমস্ত কথা ছায়া-চিত্রের ন্যায় কণিকার মনে পর্য্যায়ক্রমে উদিত হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে কণিকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দিদি, তুমি মানবী নও —দেবী!" স্বামীও তাহাকে ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন মনে করিয়া বিমলার মুখে হাসি আসিল ; সে বলিল—তোমরা সকলে মিলিয়া যদি আমাকে দেবীত্ব প্রদান কর, নাচার, কিন্তু আমি জানি, আমি সম্পূর্ণ স্বার্থপর, অনুদার, হীনা, সামান্যা রমণী ; হৃদয়ে আত্মত্যাগ বা উদারতার চিহ্নমাত্র নাই, কেবল সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা। স্বার্থের হানি আমি সহ্য করিতে অসমর্থ, তাই আমি আত্মত্যাগী, তাই আমি উদার, তাই আমি সতীনকে স্বামী ছাড়িয়া দিয়াছি—কিন্তু সে আমার মহত্ত্বের জন্য নয়—শুধু হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতার জন্য।"

"তোমার হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থপরতা থাকতে পারে না! যাদের থাকে, তারা কখনও মুখে প্রকাশ করতে পারে না, গোপন করিয়া রাখে, আবরণ উন্মোচন করিয়া কেহ অন্তর দেখিতে পারে না, কেহ দেখাইতেও পারে না, কিন্তু গোপনে থাকিলেও অন্তরের ভাব কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে ; তাই লোকে মানুষের মধ্যে দেবতা ও দানব কে, চিনিতে পারে—তুমি যথার্থই দেবী।"

"তুই যদি এ বক্তৃতা শ্রীশবাবুর কাছে কর্ত্তে পার্ত্তিস, তোর অদৃষ্ট এমন হতো না।"

"তখন যে আমার মুখ ফুটত না দিদি ; আমি কি কখন স্বপ্নেও ভেবেছিলাম,যে আমি তাঁকে হারাব—হারিয়ে আবার বেঁচে থাকব! কিন্তু মানুষের প্রাণ বড় কঠিন দিদি, জানে চিরদিন দুঃখ ভোগ করতে হবে—তবুও মরতে চায় না—সহস্র দুঃখ ভোগ করেও সে যেন দুঃখভোগের প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে না, তাই বাঁচিয়া থাকে ; দুঃখের জীবন বড় দীর্ঘ।" বিমলা 'সন্ধ্যা হয়েছে' বলিয়া কণিকাকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুধাংশুকুমার আজ কয়েক দিন হইতেই কেমন অন্যমনা, সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক, বার বার ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া যায় না! হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে, চমকিয়া উঠিয়া বলেন, 'আমাকে কি কিছু বলছ?' হেমাঙ্গিনী রাগ করিয়া বলে 'না'। সুধাংশুকুমার পুনরায় চিন্তামগ্ন হন; প্রভাতের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া তোয়ালে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রতীরে গমন করেন, বেলা দশটার পরে ফিরিয়া আসেন; তবে ইহার মধ্যে তিনি আর কোন দিন অস্নাত ফিরিয়া আসেন নাই। মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন হইবামাত্রই বাহির হইয়া যান, সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসেন। রাত্রিতে বাটীতেই থাকেন, কিন্তু সর্ব্বদাই অন্যমনা, কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই, এমন কি, তাঁহার সেই নক্সার বাক্স—যাহাকে হেমাঙ্গিনী তাহার সতীন আখ্যা দিয়াছিল—তাহার উপর এই কয়দিনে অর্দ্ধইঞ্চি ধূলা জমিয়া গিয়াছে। সুধাংশুকুমারের ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনীও বিরক্ত ও কুপিতা হইয়া তাঁহার সহিত বড় কথা কহিত না, কিন্তু পর পর বার তের দিন গত হইল, ইহার মধ্যে সে স্বামীর কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না। তাহার মনে অত্যন্ত ভয় হইল, কি জানি এ যদি কোনপ্রকার ব্যাধি হয়,—সে রাগ করিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে মনে করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইল। আজ সে তাঁহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিবে, কিছুতেই

আজ আর সে রাগ করিবে না। সন্ধ্যার পরে সুধাংশুকুমার ফিরিয়া আসিলে হেমাঙ্গিনী জলখাবারের থালা লইয়া সুধাংশুকুমারের নিকট যাইয়া বলিল, "জল খাও।" সুধাংশু নিরুত্তর, হেমাঙ্গিনীর কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই! হেমাঙ্গিনী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "জল খাও"। সে কথাও সুধাংশুকুমারের কর্ণে প্রবেশের অধিকার পাইল না! হেমাঙ্গিনী স্থির করিয়াছিল, আজ আর কোনমতে রাগ করিবে না, কিন্তু আজ তাহার অন্য দিনের অপেক্ষা অধিক ক্রোধ হইল, সে সুধাংশুকুমারের গায়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "কি হয়েছে— ?"

চমকিত হইয়া সুধাংশুকুমার দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী জলখাবারের থালা হস্তে লইয়া আরক্তমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি লজ্জিত হইয়া "দাও" বলিয়া জলখাবারের থালা লইতে হাত বাড়াইলেন; হেমাঙ্গিনী অন্যদিকে থালা সরাইয়া লইয়া বলিল, "কি হয়েছে আগে বল, তার পর জল খাবে।"

"কি হবে ?" বলিয়া সুধাংশু শূন্যদৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিল, "আমি কেমন করে জানবো ? তোমার কি হয়েছে, তা তুমিই জান।"

"কই—কি হবে—কিছুই ত হয় নি !"

"তোমার কি কোন অসুখ টসুখ হয়েছে ?"

"কই ! না—কেন ?"

"তুমি সর্ব্বদাই চুপ করে কি ভাব, ডাক্‌লে সাড়া পাওয়া যায় না; ভাল করে কথা কও না; আমার মাথা খাও, সত্যি করে বল,

তোমার শরীর ভাল আছে তো?” এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী অগ্রসর হইয়া জলখাবারের থালা লইয়া স্বামীর ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার মুখে খাবার তুলিয়া ধরিল। সুধাংশুকুমারের মনে অনুতাপ হইল; হেমা তাঁহাকে ভালবাসে; তাই তাঁহার ভাবান্তর তাঁহার নিজের বোধগম্য না হইলেও হেমার চক্ষে ধরা পড়িয়াছে—হেমার কোন দোষ নাই। বিমলা বলিয়াছিল, হেমার মনে কষ্ট হইবে, আমার কথা প্রকাশ করিও না। সে সপত্নী হইয়া হেমার দুঃখ বুঝিয়াছিল, সপত্নীর মনে কষ্ট হইবে বলিয়া আত্মসুখ বলি দিতেছে। আর আমি স্বামী হইয়া, হেমার কষ্ট বুঝিতে পারি নাই! আজ কয়দিনের মধ্যে তাহার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহি নাই। জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুকুমারের কিঞ্চিৎ অনুতাপযোগও হইয়া গেল। তিনি জলযোগান্তে হেমাঙ্গিনীর নিকট পান চাহিলেন। হেমা বলিল, “আঁচলে বাধা আছে, খুলে খাও—আমি একটু আরামে আছি।” স্বামীর জল খাওয়া শেষ হইলে হেমা তাহার বক্ষের উপর ঢলিয়া পড়িয়া দুই হস্তে তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল। সুধাংশু পত্নীর অঞ্চল হইতে পান খুলিয়া লইয়া একটি পান তাহার মুখে গুঁজিয়া দিয়া নিজে পান খাইতে লাগিলেন, কিন্তু পরক্ষণে পুনরায় তাঁহাকে অন্যমনা হইতে দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর অত্যন্ত অভিমান হইল, সে স্বামীর ক্রোড় ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল; সুধাংশুকুমার কোন কথা বলিলেন না। অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে হেমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হইল, সে নিজের শয্যায় যাইয়া শয়ন করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিল, তাহার পরে শয্যা ত্যাগ করিয়া

উঠিয়া মুরারিকে ডাকিয়া কহিল, "মুরো, একটা কাজ কর্ত্তে পারিস্‌?"

"কি কাজ দিদি?"

"ভোর রাত্রে উঠে কোথায় যায়, দেখ্‌তে পারিস্‌? আজ উঠে গেলেই আমি তোকে ডেকে দেব, তুই লুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবি, কিন্তু দেখিস্‌, যেন জান্তে না পারে, পারবি?

"খুব পারবো।"

"আচ্ছা যা,—কাউকে কিছু বলিস্‌নে।"

হেমাঙ্গিনী, সুধাংশুকুমারের অন্যমনার সহিত তাঁহার প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ এবং বৈকালে বাহিরে যাওয়ার নিকট-সম্বন্ধের সন্দেহ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। শেষ রাত্রে সুধাংশুকুমার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বাহির হইতেই হেমাঙ্গিনী ভ্রাতাকে উঠাইয়া দিল। মুরারি অলক্ষ্যে সুধাংশুকুমারের অনুসরণ করিল। বেলা দশটার সময় মুরারি সুধাংশুর সহিত সমুদ্র-স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দিদিকে বলিল যে, সুধাংশুকুমার সেই প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, পরে তিনি স্নান করিতে সমুদ্রে নামিলে মুরারিও স্নান করিয়া আসিয়াছে। আহারান্তে হেমাঙ্গিনী পুনরায় ভ্রাতাকে স্বামীর পশ্চাদনুসরণে প্রেরণ করিলেন; এবার মুরারি একঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—সুধাংশু-কুমারকে সে স্বর্গদ্বারে একটি বৃহৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। হেমাঙ্গিনী বলিল, "তুই সেখানে থেকে দেখ্‌লিনে কেন, যদি অন্য কোথাও যায়?"

"আবার যাব ?"

"না, যদি সেখানে না থাকে—আজ আর খোঁজ পাবিনে।"

তৎপর দিবস হইতে মুরারি ছায়ার ন্যায় সুধাংশুকুমারের অনুসরণ করিতে লাগিল; প্রাতঃকালে সমুদ্রতীর এবং বৈকালে স্বর্গদ্বারের সেই বাটীতে প্রবেশ এবং সন্ধ্যার সময় সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বাটীতে আগমন করা ভিন্ন মুরারি সুধাংশুকুমারকে অন্য কোন স্থানে যাইতে দেখিতে পাইল না। হেমাঙ্গিনী তখন স্বর্গদ্বারের সেই বাটীর সংবাদ জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন, এবং মুরারিকে সেই বাটীর সংবাদ লইতে বলিলেন; কাহার বাটী, বাটীতে কে থাকে, সুধাংশুকুমার কি জন্য সেখানে গমন করেন, সমস্ত জানিতে হইবে। মুরারি পরদিবস প্রাতঃকালে আর সুধাংশুর অনুসরণ না করিয়া স্বর্গদ্বারের সেই বাটীর সন্ধানে গেল, সেখানে সন্ধান লইয়া এই মাত্র জানিতে পারিল যে, সে বাটীতে কণিকাসুন্দরী দেবী নামে একটি ধনাঢ্যা স্ত্রীলোক বাস করেন। সমুদ্রতীরে যে প্রকাণ্ড মন্দির ও আশ্রম প্রস্তুত হইতেছে, তিনিই তাহা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। ইহার অধিক সে আর অন্য কোন সংবাদ পাইল না। তখন সে সাহস করিয়া সেই বাটীতেই সংবাদ লইবে স্থির করিয়া বাটীর সম্মুখীন হইতেই দেখিল, সেই বাটী হইতে দুইটি অসামান্যা সুন্দরী স্ত্রীলোক বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল। এই গাড়ীখানি সে কয়দিন স্নানের ঘাটে দেখিয়াছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল, এই গাড়ীখানি চলিয়া যাইবার পরেই সুধাংশুকুমার স্নানের জন্য সমুদ্রে নামিতেন। সে নিশ্চয় বুঝিবার জন্য সমুদ্রতীর দিয়াই স্নানের ঘাটে

ছুটিয়া গেল—গাড়ী তখনও ঘাটে আসিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু সুধাংশুকুমার ঠিক তাঁহার সেই স্থানে বসিয়া আছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোক দুইটি স্নান করিতে নামিয়া গেল। তাহাদের পশ্চাতে একজন ভীমকায় ভদ্রবেশী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণও গাড়ীর উপর হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের সহিত স্নান করিতে গেল,—সুধাংশুকুমার ঠিক সেই স্থানে বসিয়া আছেন। স্নানান্তে স্ত্রীলোক দুইটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সহিত গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল, সুধাংশুকুমারও উঠিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেলেন। মুরারি বাটীতে আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে সব কথা বলিবার পরে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীলোক দুইটি দেখিতে কেমন?"

"দুজনেই তোমার চেয়েও দেখতে ফরসা।" হেমাঙ্গিনীও অত্যন্ত সুন্দরী।

"আমার বয়সী,—না আমার চেয়ে ছোট।"

"দুজনেই তোমার চেয়ে বয়সে বড়।"

"একজন ত নিশ্চয়ই কণিকাসুন্দরী, অপর জন কে?"

"তাহা জানি না; শুনিলাম, তারা নাকি দুই বোন।"

ফ্রান্সদেশের গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান কর্ত্তা ফুসী কোন অপরাধের কথা শুনিবামাত্রই বলিতেন, 'ইহার মূলে যে স্ত্রীলোক জড়িত আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার অনুসন্ধান কর, অপরাধের কিনারা হইবে আসামী ধৃত হইবে।' হেমাঙ্গিনীর মনেও স্বামীর অন্যমনাভাব এবং সকালে বৈকালে বাহিরে যাওয়ার মূলে যে স্ত্রীলোক আছে, এ ধারণা

প্রথম হইতেই স্নুসীর স্থির ধারণার মত উদয় হইয়াছিল, সেই জন্ত সে তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্ত ভ্রাতাকে নিয়োগ করিয়াছিল; তাহার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, সুধাংশুকুমার স্বর্গদ্বারের যে বাটীতে প্রত্যহ অর্দ্ধ দিবস কাটাইয়া আসেন, সে বাটীতে একটি নয়— দুইটি অসামান্তা সুন্দরী বাস করে! ইহাদিগের একটি নিশ্চয় কণিকাসুন্দরী, কিন্তু অপরটি কে? সুধাংশুকুমারই বা প্রত্যহ তাহাদের বাটীতে যান কেন? তাহারা কি তাঁহার আত্মীয়? না, আত্মীয় হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিতেন। তবে তিনি কি জন্ত সুন্দরীদিগের বাটীতে যাতায়াত করেন! তাহাদের সহিত তাঁহার এমন কি সম্বন্ধ যে, তিনি প্রত্যহই নিয়মমত সেখানে একবেলা করিয়া কাটাইয়া আসেন? ইহার সন্ধান লইতেই হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া, মুরারিকে দিয়া সে কার্য্য হইবে না। তবে কাহাকে দিয়া সন্ধান লইবেন? ঠিক এই সময়ে নেত্যদিদি আসিয়া বলিল, "ও হেমা, জামাইবাবু যে চান করে এসেছেন খেতে দিগে যা।" নেত্যদিদিকে দেখিয়া হঠাৎ হেমাঙ্গিনীর মনে হইল, নেত্যদিদিই এই সন্ধান লইতে পারিবে, সে তাহাদের বাটীর অতি পুরাতন ঝি, তাহাদের সকলকেই সে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সে তাহাদিগকে আপনার ভ্রাতাভগিনীর মত দেখে ও তাহাদিগকে সেইরূপ স্নেহ-যত্ন করে। সুধাংশুকুমারের শ্বশুর-গৃহে নেত্যর বিশেষ প্রতিপত্তি, সে স্বয়ং কর্ত্তাকেও ভয় করে না; আবশুক হইলে তাঁহাকেও দশ কথা শুনাইয়া দেয়, বাটীর অন্তান্ত সকলেই বরং নেত্যকে ভয় করে। হেমাঙ্গিনী এবং তাহার অন্ত

ভ্রাতাভগিনীগণ সকলেই তাহাকে নেত্যদিদি বলিয়া ডাকে। হেমাঙ্গিনীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নেত্য বিরক্ত হইয়া বলিল, "হেঁলা, তোর আক্কেলটা কি? জামাইবাবুকে ভাত দিবি না? উঠে যা, আমি ঠাঁই করে দিয়ে বামুনঠাকুরকে ভাত বাড়তে বলে এসেছি। মুরো, তুই এখনও চান করিস্‌নি! যা যা—শীগগির চান করে আয়।"

"যা মুরো চান করে আয়, আমি আর তুই এক সঙ্গে খাব।" বলিয়া হেমাঙ্গিনীও মুরোকে স্নানের জন্য যাইতে বলিলেন। মুরারি প্রস্থান করিলে হেমাঙ্গিনী বলিল, "নেত্যদিদি, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"এখন আমি এ দুপুর বেলা কোন কাজ-টাজ করতে পারবো না, বাবু। কাল একাদশী গেছে এখনও মুখে একটু জল দিতে পারি নি।"

"এখন না—বিকালে।" এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী স্বামীর আহারের স্থানে গমন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত হইলেন।

গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আহারান্তে নেত্যদিদি একটু তন্দ্রান্বিত হইলেন; বেলা চারিটার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে তখন তাহার মনে পড়িল, হেমা তাহাকে কি কাজের কথা বলিয়াছিল; সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে আসিল এবং চখে-মুখে জল দিয়া, হেমাঙ্গিনীর নিকট গমন করিয়া সেই কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিল। হেমাঙ্গিনী তাহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিয়া অবশেষে বলিল, "নেত্যদিদি, তাহারা কে—তোমাকে জানিতে হইবে, আর উনিই বা সেখানে প্রত্যহ কি করিতে যান, তাহারও সন্ধান লইতে হইবে। মুরো তোমাকে

তাহাদের বাটী দেখাইয়া দিবে। তোমাদের জামাইবাবু এখন সেই-খানেই আছেন। নেত্যদিদি হেমাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে, হেমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তাহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল; সে মুরারিকে ডাকিয়া বলিল, "চল্‌তো দাদা, আমাকে সেই ডাকিনী-মাগীদের বাড়ীটা দেখিয়ে দিবি।"

মুরারি নেত্যদিদিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে কণিকা-সুন্দরীর বাটী দেখাইয়া দিল। নেত্যদিদি মুরারিকে বাটীতে ফিরিয়া যাইতে বলিল এবং বলিয়া দিল,"হেমাকে বলিস,আমার হয়ত ফিরতে রাত্রি হবে,আমার জন্তে যেন ভাবনা না করে।" সন্ধ্যার সময় সুধাংশু-কুমার কণিকাসুন্দরীর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন, নেত্য-দিদি অন্তরালে থাকিয়া তাহা দেখিল; ডাইনীমাগী দুইটি যে তাহাদের জামাইবাবুকে গুণ করিয়াছে,তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাহাদিগের উপর নেত্যদিদির অত্যন্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু কি উপায়ে ডাইনীদের জব্দ করিবে স্থির করিতে পারিল না। তাহাদিগের বাটীতেও সেদিনে নেত্যদিদি প্রবেশ করিবার কোন সুযোগ পাইল না, রাত্রি অধিক হইল। অগত্যা নেত্যদিদি সেদিন ফিরিয়া গেল। পরদিন নেত্যদিদি প্রত্যুষে উঠিয়াই গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, প্রাতঃকালেই সেখানে গমন করিল। আজ তাহার উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইল। কণিকাসুন্দরীর দাসীর সহিত নেত্যদিদির পরিচয় হইল, দাসী তাহাকে জগন্নাথের মন্দির দেখাইয়া আনিবে বলিয়া সন্ধ্যার সময় তাহাদের বাটীতে আসিতে বলিল। নেত্যদিদির উদ্দেশ্য সফল হইল, আজ তিনি ডাকিনীদিগের গৃহে প্রবেশ করিবেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া নেত্যদিদি কথায় কথায় দাসীর নিকট কণিকাসুন্দরীর ও বিমলার সমস্ত কথা জানিয়া লইলেন—সুধাংশু-কুমারের সহিত বিমলার সম্পর্কের কথা শুনিয়া নেত্যদিদির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—হেমার সতীন আছে! মা হেমাকে সতীনের ঘরে বিবাহ দিয়াছেন! কই, এ কথা ত তাহারা কেহই জানে না, এ সম্বন্ধে কোন কথাইত কখনও তাহাদের কর্ণগোচর হয় নাই! এ কথা শুনিলে হেমা যদি কিছু করিয়া বসে,—না, হেমাকে এ সংবাদ জানিতে দেওয়া হইবে না, খুরোকে দিয়ে বাবাকে আসিবার জন্ত সংবাদ দিতে হইবে, তাঁহারা আসিয়া যাহা ভাল বিবেচনা করেন করিবেন, তখন আর তাহার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। মন্দিরে আরতি দেখিয়া নেত্যদিদি দাসীর নিকট বিদায় লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল; হেমা তাহাকে কোন সন্ধান পাওয়া গেল কি না জিজ্ঞাসা করিলে নেত্যদিদি বলিল, "অত ব্যস্ত হলে কি হবে দিদি, তাদের বাড়ীর দাসীর সঙ্গে আলাপ করে এসেছি, দু' চারদিনের মধ্যে সব খবর পাবো।" সেইদিন রাত্রিকালে হেমাঙ্গিনী শয়ন করিলে, নেত্যদিদি মুরারিকে দিয়া দুর্গানাথবাবুকে পত্র লিখাইল, পত্রে সে দুর্গানাথবাবুকে মাকে সঙ্গে লইয়া আসিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিল। দুর্গানাথবাবুর স্ত্রীকে নেত্যদিদি মা বলিত। পত্রে সকল কথা প্রকাশ না করিলেও, হেমার যে একটি সতীন আছে, এ কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। মুরারিকে নেত্যদিদি কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রামেশ্বর ও মাহাতোগণ পরদিবস বরেনবাবুর সহিত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইক্ষু-দ্বীপ যাইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে সকলেই স্বেচ্ছায় সম্মতি জানাইল। কুলী-আইনের নিয়মে তাহারা পাঁচ বৎসরের জন্য ইক্ষু-বণিকগণের কার্য্য করিতে বাধ্য হইল।

ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে বাহির হইয়া রামেশ্বর ও মাহাতো-গণের খিদিরপুরে যাইবার আদেশ হইল, সেইস্থানেই কোম্পানীর ইমিগ্রেসন কুলীর প্রধান আড্ডা; নানাস্থানের কুলী-ডিপো হইতে কুলী সংগৃহীত হইয়া এইস্থানে প্রেরিত হয় এবং এইস্থান হইতেই তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া ইক্ষুদ্বীপে প্রেরণ করা হয়। বরেনবাবু, রামেশ্বর ও মাহাতোদিগকে তাহাদের তৈজস-পত্রের সহিত গাড়ী করিয়া আদালতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এফি-ডেবিট হইয়া গেলে, তিনি কমিশনের টাকা আদায় করিবার জন্য এজেন্টের আপিসে গমন করিলেন। কয়েকজন মেট রামেশ্বর ও মাহাতোগণকে সঙ্গে করিয়া, আদালতের বাহিরে আনয়ন করিয়া, তাহাদিগকে খিদিরপুর যাইতে আজ্ঞা করিল। রামেশ্বর বলিলেন, "গাড়ী কোথা?" গাড়ীর কথা শুনিয়া মেটেরা "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "ওরে, বাবুর গাড়ী ডেকে এনে দে, বাবু কুলিগিরি করতে যাচ্ছেন, হেঁটে যাওয়া

ভাল দেখায় না !" আর একজন মেট বলিল, "নে—নে, এখন তামাসা রাখ, আর বিলম্ব করিস্‌ নে, ওদের নিয়ে এখন চার ক্রোশ রাস্তা যেতে হবে। তারপর সব গুছিয়ে নিয়ে আজই আটটার সময় জাহাজে উঠতে হবে, নে রে—তোরা মোট তোল।"

রামেশ্বর মোট মাথায় করিয়া খিদিরপুর যাইতে হইবে শুনিয়া বলিলেন, "আমি যাব না।" "তোর বাবা যাবে শালা, বাক্স তোল" বলিয়া দ্বিতীয় মেট সপাত করিয়া রামেশ্বরের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিল। রামেশ্বর চিরকাল গুণ্ডাগিরি করিয়া আসিয়াছেন, তিনি মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিবার লোক নহেন, সুতরাং তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া এক পদাঘাতে মেটকে ভূতলশায়ী করিলেন, অপর তিনজন মেট তৎক্ষণাৎ তিন দিক হইতে আসিয়া, বেত, লাথি, কিল, চড় দিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল। লোক জমিয়া গেল, পাহারা-ওয়ালা, জমাদার, সার্জ্জন আসিয়া পড়িল। ইতোমধ্যে এজেণ্ট সাহেব নামিয়া আসিয়া, মেটদিগকে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিতীয় মেট বলিল, "হুজুর, এই শালা কুলীলোক ডিপোয় যেতে চাইছে না, ডিপোয় যেতে বলায় আমাকে মারধর করেছে।" "বটে !" বলিয়া সাহেব রামেশ্বরকে সজোরে এক লাথি মারিয়া বলিলেন, "উঠ্‌ শুয়ার কি বাচ্ছা।" গৌরাঙ্গের সবুট পদাঘাত রামেশ্বরের পৃষ্ঠে পতিত হইবা মাত্র রামেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বিতীয় মেট রামেশ্বরকে বলিল, "তোল, বাক্স তোল !" সার্জ্জন এবং জমাদার, গৌরাঙ্গ দেখিয়া পাহারাওয়ালাদিগকে ভিড় সরাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। রামেশ্বরকে বাক্স তুলিতে অসমর্থ দেখিয়া

দুইজন মেট বাক্সটি ধরিয়া তাঁহার মাথায় উঠাইয়া দিল, সকলে তখন খিদিরপুর যাত্রা করিলেন।

শ্রীশবাবুর বাটী হইতে যখন রামেশ্বর তাড়িত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাকে এইরূপ বাক্স মাথায় করিয়া লইয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। স্বাধীনতার অধিকার বর্জ্জিত হইয়া আজ পুনরায় তিনি রাজপথে সেই বাক্স মাথায় লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। প্রভেদের মধ্যে এ বাক্সটি তাঁহার পূর্ব্বের বাক্সটির অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং কিঞ্চিৎ অধিক ভারী। আদালত হইতে বাহির হইয়া কিয়ৎ দূর গমন করিয়া রামেশ্বর রাস্তার উপর বসিয়া পড়িয়া বাক্সটি কোনমতে মস্তক হইতে নামাইয়া বলিলেন, তিনি এ বাক্স মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহাকে বসিতে দেখিয়া দ্বিতীয় মেট তাঁহার নিকট আসিতেছিল; রামেশ্বরের কথা তাহার কর্ণগোচর হইল। সে বলিল, "তোর বাবাকে ডাক।" রামেশ্বরের এক্ষণে জ্ঞান হইয়াছিল, তিনি কাতরস্বরে কহিলেন, "সর্দ্দার সাহেব, আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে একটা মুটে করে বাক্স নিয়ে যেতে হুকুম করুন, আমি এ নিয়ে যেতে পারব না।" মেট সাহেব রামেশ্বরের এই প্রকার হীনতা স্বীকারে একটু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মুটের পয়সা কে দেবে?" উত্তরে রামেশ্বর তিনিই পয়সা দিবেন বলায়, মেট মুটিয়া ডাকিল। মুটিয়া খিদিরপুর যাইতে প্রথমে অস্বীকার করিল; পরে বলিল, একটাকা মজুরী পাইলে সে যাইতে পারে। রামেশ্বর তাহাতে সম্মত হইয়া একটি টাকা বাহির করিয়া মেটের হস্তে দিলেন, মেট টাকাটি লইয়া মুটিয়াকে খিদিরপুর যাইবার মজুরি দুই আনা বলিতে

মুটিয়া আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঝাঁকা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। মেটেরা তখন মাহাতোদিগের একজনের নিকট হইতে তাহার স্বল্প মোট লইয়া রামেশ্বরকে দিল এবং রামেশ্বরের বাক্স তাহার মস্তকে চাপাইলে, মাহাতোগণ কোনরূপ আপত্তি করিতে সাহস করিল না; রামেশ্বরের লাঞ্ছনা দেখিয়া তাহাদের মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল; তাহারা একমনে "মা কালীকে" ডাকিতে ডাকিতে মেট-গণের সহিত খিদিরপুরের কুলীডিপোয় চলিল। কালী মাথা অন্তরে কালী নাম ফুটিয়া উঠিল না, মা কালী তাহাদিগের রক্ষার কোন উপায় করিলেন না—অথবা করিতে পারিলেন না। মানুষ যতক্ষণ কোনরূপ বিপদে পতিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের দেবতার কথা স্মরণপথে উদিত হয় না, যখনই বিপদ উপস্থিত হয় প্রথমে নিজে সেই বিপদ্ মুক্তির চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু যখনই দেখিতে পায় নিজের চেষ্টায় সে বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যাইবে না, অমনি তাহাদের প্রাপিতামহিকঠাকুর-দেবতার কথা স্মরণ হয়, আর তৎক্ষণাৎ আপনাকে সেই ঠাকুর-দেবতাদিগের কৃপাপ্রার্থী হইয়া নিরাপদ হইতে চায়। যদি কোনমতে বিপদ কাটিয়া যায়, উত্তম; নচেৎ সমস্তই ভগবানের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া বলে, 'ভগবান করেছেন, কি করবো, আমার কোন হাত নেই।" সুতরাং মাহোতোগণ যে মা কালীর স্মরণ লইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

সন্ধ্যার সময়ে তাহারা সকলে খিদিরপুরের কুলি-ডিপোয় উপস্থিত হইল; সেখানে আরও দেড়শত কুলি ছিল। রামেশ্বর প্রভৃতি ডিপোয় উপস্থিত হইবার অল্পক্ষণ পরে আহারের ঘণ্টা হইল। ডিপোয় দেড়শত

কুলি, জেলখানার কয়েদীদিগের ন্যায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, হাড়ি-চামারের সহিত ব্রাহ্মণ-ইসলাম মিলিত হইয়া আন্তর্জাতিক মহাভোজে এক সঙ্গে টিনের থালা এবং মাটির ভাড় লইয়া উপবেশন করিল। রামেশ্বর ও তাঁহার সঙ্গী মাহাতোগণকেও কয়েকটী মাটীর ভাঁড় ও টিনের থালা প্রদত্ত হইল। এই থালায় আহার এবং এই ভাঁড়ে জল পান এবং শৌচ-আচমনাদি করিতে হইবে। ইহারা আজ নূতন কুলি-ডিপোয় আসিয়াছে; ইহাদিগের হৃদয়ে এখনও সার্ব্বজাতিক সাম্যভাব পরিস্ফুট হয় নাই সুতরাং ইহারা এই আন্তর্জ্জাতিক ভোজ-সম্মিলনে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইল। পরিবেশনকারী ঋষি নফরচন্দ্র, ওরফে নফরা মুচি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, তোমরা, —আপনারা ?" রামেশ্বর উত্তর করিলেন—তিনি রাজপুত। রামেশ্বরের কথা শুনিয়া নফরচন্দ্র একগাল হাসিয়া বলিলেন, "ও নোজপুত বটে, তোমরা ত বড্ডি বড় জাত, ঐ ওদিকে দেখ, আমগার গাঁর ভরু শারমোনীর ছাওয়াল, কালীবাহে, আরও কত চাহে, বক্কাযি, মিতির, মোড়লরা রয়েছেন, সগ্‌গুলি আমার নান্না খাচ্চে, আমরা ভাল জাত—নিসি—নিসি, ইংরেজ বাহুর তাইতো আমাকে নাধুনী করেছে—নেও থালা পাত, তোমায় আর কুম্রোগিরি করতে হবে না,—নোজপুত আবার একটা জাত !"

যে সমস্ত কুলী আহার করিতে বসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্য হইতে একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মশায়, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন! যখনই ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেবিট করিয়া স্বইচ্ছায় বিদেশে কার্য্য করিতে যাইতেছেন, স্বীকার করিয়াছেন, তখন হইতে

জাতি, ধর্ম্ম, মান, ইজ্জত, সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছেন—আমিও প্রথমে আপনার মত করিয়াছিলাম, কিছুতেই আহার করিতে সম্মত হই নাই; আমার হাত পা পিঠ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন;—শুধু তাহাই নহে, যাক, যখন এখানে এসেছেন, পূর্ব্বজীবনের কথা ভুলিয়া যান, কি করবেন—'নিয়তি কেন বাধ্যতে' বলিয়া ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিলেন, জন্মজন্মান্তরের পাপের যদি এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হয়, ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম হইল কেন বুঝিতে পারি না! তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। রামেশ্বর ও তাঁহার সঙ্গী মাহাতোগণ মেটদিগকে পূজা দিয়া সে রাত্রির জন্য নিষ্কৃতিলাভ করিলেন—আজও তাঁহাদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সাতটার সময় ডিপোর কুলিদিগকে তাহাদের দ্রব্যাদি লইয়া জাহাজে যাইবার আজ্ঞা দেওয়া হইল। কুলিরক্ষক সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে চালান দিবার জন্য গুনতি করিয়া জাহাজে প্রেরণ করিলেন, আটটার সময় সকলে জেটীতে আসিয়া জাহাজে উঠিল। রাত্রি দশটার সময় জাহাজ নোঙর তুলিয়া ইক্ষুদ্বীপ যাত্রা করিল। অন্য ডিপো হইতেও অনেক কুলি এই জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল, সর্ব্বশুদ্ধ ইহাদের সংখ্যা প্রায় ছয় শত হইবে। প্রত্যেক ডিপোর এক এক জন সর্দ্দার মেট ইহাদের তত্ত্বাবধায়ক; প্রত্যেক দলের পৃথক রাঁধুনী। আমাদের রামেশ্বর যে দলে পড়িয়াছিলেন, সেই দলের সর্দ্দার মেটের নাম তাহের খাঁ, ইহার অধীনে বার জন সাব-মেট এবং প্রত্যেক সাব্-মেটের জিম্মায় বার জন করিয়া কুলী; ঘোড়া হইলে বার জন, গরু হইলে ছয় জন ও গাধা হইলে তিন জন লোক যাহাতে আবশ্যক হইত—বারটি ছাগল হইলেও অন্ততঃ দুই জন রক্ষক না হইলে চলিত না—কিন্তু এই বার জন কুলি এক জন রক্ষকের ইঙ্গিতে সুশৃঙ্খলে চলিবে, ইহাদিগের দ্বারা বারটি অশ্বের, চব্বিশটি গরুর এবং এক শত গাধার খাটুনি খাটাইয়া লওয়া হইবে, অথচ ইহাদিগের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও ব্যয় হইবে না; সুতরাং কৃষিকার্য্যে যদি ঘোড়া-গরুর মত মানুষ নিযুক্ত করিতে পারা যায়,—কৃষিলব্ধ

লভ্যের পরিমাণ শতগুণ অধিক হয়। কিন্তু মানুষ সেরূপে রাখা কঠিন, তাই দাস-আইন হইয়াছিল। হৃদয়বান্ কতিপয় প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব ব্যক্তি, পালিত পশু অপেক্ষাও ক্রীতদাসের অধিক দুর্গতি দেখিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় ক্রীতদাস-আইন উঠাইয়া দেন; কিন্তু বণিকদিগের আবশ্যক বলিয়া ভারতে কুলি-আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—ইহার মর্ম্ম ক্রীতদাস-আইনের ন্যায় না হইলেও ফলে সেইরূপ দাঁড়াইল—বণিকগণ আইনকর্ত্তাদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, ইহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করিতে লাগিলেন। আইন বড়লোকের জন্য—গরীবের জন্য নয়।

কুলি-ডিপোতে যে ব্রাহ্মণ রামেশ্বরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি, রামেশ্বর ও তাহার সঙ্গী সাত জন মাহাতো, নিসি নফরচন্দ্র এবং তাঁহার দুই জন সহকারী,—বিশ্বনাথ ওরফে বিশে চাঁড়াল এবং মাণিকচন্দ্র—সাধারণতঃ মানকে হাড়ী—এই বার জনকে লইয়া যে দল গঠিত হইয়াছিল, ইহারা আমাদের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত মেটগণের মধ্যে রামেশ্বর যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, সেই মেটের জিম্মা; নিসি নফরচন্দ্র ইহাদের পাচক এবং বিশ্বনাথ ও মাণিক তাহার সাহায্যকারী; ইহাদিগকে আমরা রামেশ্বরের দল বলিতে পারি। ব্রাহ্মণটির নাম নির্ব্বিকারচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ইনি বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যবশে পাশ করিতে পারেন নাই, তাহার উপর দুষ্কার্য্যের জন্য পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাগ করিয়া ছাপরায় যান। সেখানকার আড়কাটী বাবুরাম মাইতি তাঁহাকে বেশী টাকা মাহিয়ানায় ইক্ষুদ্বীপে স্কুল-মাষ্টারী চাকরী

করিয়া দিবে বলিয়া—নির্বিবকারচন্দ্র যখন কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহাকে দাদনের টাকা প্রদান করে। প্রাদেশিক ডেপুটি-কমিশনারের নিকট এফিডেবিটের দিনে কোর্টে যাইবার সময় বাবুরাম বাহিরের দিক হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "নির্বিবকারবাবু, আপনার পিতাঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন।" নির্বিবকার বলিলেন, "উপায়! বাবাত, আমাকে যেতে দেবেন না!" আশ্বাস দিয়া বাবুরাম বলিল, "ভাবনা কি? আপনি এফিডেবিট পত্রে সহি করিয়া সম্মতি লিখিয়া দিন, আমাদের এজেন্ট সাহেব আসিয়াছেন, আপনাকে আর আদালতে যাইতে হইবে না।"

নির্বিবকারবাবু সম্মতি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। আদালতে যথাসময়ে কুলিদিগের ডাক পড়িল, এজেন্ট সাহেব ডেপুটি কমিশনার সাহেবের পার্শ্বে একখানি কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন, পরপর পঁয়ত্রিশ জন কুলির এফিডেবিট হইবার পরে এজেন্ট সাহেব স্বহস্তে নির্বিবকারের এফিডেবিট সহ সম্মতি-পত্র, ডেপুটি-কমিশনারের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি তাহার কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে উপস্থিত করিতে পারিলাম না। ডেপুটী-কমিশনার সাহেব কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়াই নির্বিবকারের এফিডেবিট-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। সেইদিনই নির্বিবকারচন্দ্র ছাপরা হইতে দুই ক্রোশ দূরে, কুলীডিপোয় প্রেরিত হইলেন। সেখানে প্রবেশ করিবা মাত্র, নির্বিবকার বুঝিতে পারিলেন, তিনি কি সর্ব্বনাশের কার্য্য করিয়াছেন। জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তিন দিন পর্য্যন্ত নানাপ্রকারে উৎপীড়িত এবং বিষম

প্রস্তুত হইয়াও যখন তিনি কোনমতে সেখানে জলগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, এজেন্ট সাহেবের নিকট সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি খাজাখাঁনামক কুলি বশীকরণে বিশেষ পারদর্শী তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে কাফেরদিগকে বলপূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া, মুসলমানেরা তাহাদিগের ও কাফেরদিগের বেহেস্তে যাইবার প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিতেন; ইংরাজ রাজত্বে তাহাদিগের সেই প্রকারে বেহেস্তে যাইবার সুপ্রশস্থ পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মুসলমান না করিতে পারিলেও—একটি কাফেরের জাতি মারিতে পারিলেও—খাজা সাহেব বেহেস্তে যাইবার অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতে পারিবেন মনে করিয়া পরমোৎসাহে ডিপোয় আগমন করিয়া ভগবতীর ঝোল প্রস্তুতের আজ্ঞা দিলেন। যথাসময়ে খাদ্য প্রস্তুত হইলে তিনি স্বহস্তে হস্তপদবদ্ধ নির্ব্বিকারচন্দ্রের মুখে সেই ঝোল ঢালিয়া দিয়া ব্রাহ্মণের জাতি-ধর্ম্ম নাশ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। নির্ব্বিকার কুলিডিপোয় প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিয়াও জাতি-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু শ্রীমধুসূদনের ডাক বৃথা হইবার নহে; তিনি নির্ব্বিকারের জাতি ও ধর্ম্ম সংরক্ষণে অসমর্থ হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার কৃপাবলে নির্ব্বিকারচন্দ্র নির্ব্বিকার চিত্ত হইলেন, তাঁহার হৃদয় হইতে অহঙ্কার প্রস্থান করিল। ভগবতীর ঝোল পান করিয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, তিনি যজ্ঞোপবীত এবং তাহার সহিত তাঁহার জাতীয় পদবী পরিত্যাগ করিয়া নামে ও কার্য্যে নির্ব্বিকার হইলেন।

পরদিবস বেলা নয়টার সময়, কুলিদিগের আহারের ঘণ্টা হইল। রামেশ্বরের দলের রামেশ্বর ও অন্যান্য দলের কয়েক জন ব্রাহ্মণ ভোজনে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইল না। ব্রাহ্মণ কয়জনকে আড়কাটীরা ইক্ষুদ্বীপে যজন-যাজনাদি-কার্য্যের লোভ দেখাইয়া কুলীশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল, তাঁহারা নির্ব্বিকারের নিকট তাহার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ ও যজ্ঞোপবীতাদি গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে নিক্ষেপ করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থাদি সঙ্গে লইয়া ডেকের উপর হইতে সমুদ্র-সঙ্গমে লম্ফ প্রদান করিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই তিন জনকে উদ্ধার করা হইল বটে; কিন্তু তাঁহারাও অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়া সাগর-সমাধি লাভ করিলেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিয়া পাঠকের মনে কুলি-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিবার আবশ্যক নাই, আমি কুলিকাহিনী লিখিতে বসি নাই। আমার আখ্যায়িকায় সংসৃষ্ট কয়েক ব্যক্তির কথা বলিতে গিয়া সামান্য একটু পরিচয় দিতে হইল। কুলিদিগকে সাত ভাগ জলের সহিত এক ভাগ ভাতমিশ্রিত ভাতনামক অপূর্ব্ব খাদ্যের অর্দ্ধসের, দালনামক এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ জল এক পোয়া, এক চামচ শুষ্ক মৎস্য এবং একটু তেঁতুল প্রাতর্ভোজনের জন্য প্রদত্ত হইত। বৈকালে বেলা চারিটার সময় ঐ পরিমাণ ভাত, এক চামচ আলু, এবং বিশুদ্ধ ভগবতী-মাংসের টিন কাটিয়া হানিপ চাচা প্রত্যেককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহামাংস প্রদান করিয়া সকলকে চরিতার্থ করিতেন। অনেকে কৃতার্থম্মন্য হইয়া ভগবতীর সম্মান করিত, কতকগুলি ভগবতীর

কৃপাবর্জ্জিত—তাঁহার সম্মানরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া শুধু আলু-পেঁয়াজেই সজল ভাত গলাধঃকরণ করিয়া জঠর-দেবতার পূজা করিত। তাহা বলিয়া ইক্ষুবণিকেরা ইহাদিগের এইরূপ আহার্য্যের জন্য দায়ী নহেন। তাঁহারা অখাদ্য দিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহারা জল মিশাইয়া ভাতের পরিমাণ স্থির করিয়া দেন নাই অথবা উপকরণ সম্বন্ধেও কোনরূপ কৃপণতা করেন নাই; অধিকন্তু তাহাদিগকে মঙ্গলবারে বৈকালে চাপাটি এবং প্রত্যেক শনিবারে ছাগমাংস দিবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ব্যবস্থা থাকিলেই যে কুলীগণ সেই ব্যবস্থামত খাদ্য প্রাপ্ত হইত, ইহা মনে করা নিতান্ত মূর্খের কার্য্য। আমাদের রামেশ্বর প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি প্রথমে কয়েক দিবস এই সকল খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাইলেও জঠর-দেবতার তাড়না সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে সুবোধ বালকের ন্যায়—যাহা পায় তাহাই খায়—শান্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের অরুচিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পুণ্যবানেরা বারিধি-আশ্রমে মাসাধিক কাল জাহাজ-যোগ অভ্যাস করিয়া, নির্ব্বিকার, নিরানন্দ এবং নিষ্কাম হইয়া ইক্ষুদ্বীপে উপস্থিত হইল। যাহারা অত্যন্ত পাপী, জাহাজ-যোগাভ্যাসে যাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই, তাহারা ইক্ষুদ্বীপে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল। তাহারা জাতিধর্ম্ম এবং খাদ্যাখাদ্যবিচারে দ্বিধাশূন্য হইয়া পরমহংসের ন্যায় 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই পরম জ্ঞান লাভ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দুর্গানাথবাবু মুরারির পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন, এবং সেই দিবসেই গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া পুরী যাত্রা করিলেন। পিতামাতাকে অকস্মাৎ এইরূপ পুরীতে আসিতে দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর মনে কেমন সন্দেহ হইল। সে ভাবিল, নিশ্চয় নেত্যদিদি সংবাদ দিয়া বাবা ও মাকে এখানে আনাইয়াছে! কিন্তু কেন? কাল মার পত্র পেয়েছি, মা লিখেছেন দাদার অসুখ। আর কোন কারণ না থাকিলে কি হঠাৎ শুধু শুধু দাদাকে ফেলে চলে আসেন! সুতরাং হেমাঙ্গিনী তাঁহাদের আগমনের কারণ ও স্বর্গদ্বারের সেই দুইটি স্ত্রীলোকের সহিত নেত্যদিদির সাক্ষাৎ মিশ্রিত করিয়া মনে মনে একটি বিশেষ গুরুপাক মোগলাই খিচুড়ীতে পরিণত করিয়া উলের মোজা লইয়া নিজের গৃহে বসিল এবং স্থানীয় ভৃত্য রাধু উড়িয়াকে গোপনে পিতামাতা ও নেত্যদিদির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে বলিয়া দিল।

নেত্যদিদিও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল,—হেমাকে জানিতে দেওয়া হইবে না। এক্ষণে হেমাকে মোজা বুনিতে দেখিয়া, কর্ত্তা ও গৃহিণীকে সঙ্কেত করিয়া নীচে নামিয়া গেল। প্রথমে গৃহিণী পরে কর্ত্তা তাহার অনুসরণ করিলেন। রাধু আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে সংবাদ দিল, তাঁহারা সকলে সিঁড়ির ঘরের পার্শ্বের ঘরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। হেমাঙ্গিনী রাধুকে বিদায় দিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া

সিঁড়ির জানলায় বসিল, সেখান হইতে সে তাঁহাদের সকল কথাই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। হেমাঙ্গিনী আসিয়া বসিতে তাহার মাতার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইল। মাতা বলিতেছেন, "হ্যাঁরা নেতা, খবর কি ? তুই এ অসম্ভব কথা কোথায় পেলি !"

"অসম্ভব নয় মা, সত্যি কথা। ছুঁড়ির বয়স হয়েছে, কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে, একেবারে জগদ্ধাত্রীর মত। খুব ছেলেবেলা যখন জামাই-বাবুর বাবা হাজারীবাগে থাকতেন, সেই সময়ে বিয়ে হয়, তারপর বেয়াইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। তার যে রূপ মা, দেখলে আমাদেরই মন ভুলে যায়, এতেও জামাই-বাবু আজও তাকে বাড়ীতে আনেনি—সে হেমার কপাল ! অমন ইস্ত্রি ছেড়ে কি কেউ থাকতে পারে। কিন্তু ছুঁড়িটা খুব ভাল, জামাইবাবু তাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, তাতে মেয়েটি বলেছে, সে হেমার মনে কষ্ট দেবে না। সে যে জামাইবাবুর ইস্ত্রি, এ কথা হেমা জানে না ; সে জামাইবাবুকে সে কথা হেমাকে জানাতেও বারণ করে দিয়েছে। বলেছে, আমার যা হয়েছে হয়েছে, তাকে আর মিছিমিছি কেন মনকষ্ট দেবে।" হেমাঙ্গিনীর মা বলিলেন, সে মেয়ের ভাব তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। পরে তিনি নেত্যকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নেত্য বলিল, তাহার নাম বিমলা।

হেমাঙ্গিনী প্রথমে সকল কথা বুঝিতে পারে নাই, পরে "জামাই-বাবুর ইস্ত্রি' এই কথায় তাহার সকল কথা পরিষ্কার বোধ হইল—তাহার আর কোন কথা শুনিবার ইচ্ছা হইল না। সেই স্ত্রীলোক দুইটীর মধ্যে একটি তাহার সতীন, তাহার নাম বিমলা ; তাহারই জন্য

উনি প্রত্যহ ভোর রাত্রে উঠে গিয়ে সমুদ্রের ধারে বসেন, আবার দ্বিপ্রহরের পরে আহার করিয়াই তাহার নিকট চলিয়া যান। তাহার সতীন আছে—এ কথা কেহই জানিত না—উনি জানিতেন, কিন্তু কখন তাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাহার মনে অত্যন্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু সতীনকে দেখিবার ইচ্ছা মনে মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। সে নিচে আসিয়া রাধুকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিল; কিন্তু গাড়ী বাটীর নিকট না আনিয়া ঘাটের নিকট লইয়া যাইতে বলিয়া, মুরারিকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেল। দুর্গানাথবাবু গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যার পরে বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন স্থির করিলেন; তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরে হেমাকে সতীনের কথা বলিবেন।

মুরারির সহিত হেমাঙ্গিনী ঘাটের নিকট আসিতে না আসিতে রাধু গাড়ী লইয়া আসিল। হেমাঙ্গিনী গাড়ীতে উঠিয়া বলিল, "আয় মুরো, আমাকে তাদের বাড়ী দেখিয়ে দিবি।" বিস্মিত হইয়া মুরারি বলিল, "কাদের বাড়ী দিদি ?"

"কণিকাসুন্দরীর বাড়ী।"

"সে বাড়ী দেখে তোমার কি হবে ?"

"আমার দরকার আছে, আমি সেখানে যাব।"

"কেন ? তুমি সেখানে যাবে কেন ? চেনা নেই—শুনো নেই—"

"সে পরামর্শ তোর কাছে যখন নেবো তখন দিস—এখন তুই আমার সঙ্গে যাবি কি না বল, নইলে আমি রাধুকে নিয়েই সেখানে যাব।"

মুরারির নিতান্ত অনভিপ্রায় হইলেও সে গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী কণিকাসুন্দরীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই জমাদার সাহেব —আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভূপাল সিং—শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী গাড়ী হইতে নামিয়া মুরারিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রাঙ্গণ পার হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। জমাদার সাহেব মুরারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁহাসে আয়া বাবু?"

মুরারি বলিল, "এইখান থেকেই আতা হায়।" জমাদার মুরারিকে ভিতরে যাইয়া বৈঠকখানায় বসিতে বলিলে মুরারি অস্বীকৃত হইয়া বাহিরেই বসিয়া রহিল।

হেমাঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিতেই কণিকাসুন্দরীর দাসী একটি অপরিচিত ভদ্র-স্ত্রীলোককে বাটীর মধ্যে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

হেমাঙ্গিনী উত্তর করিল, "আমি এখান থেকেই আসছি. আমার দিদি কোথায় বলতে পার?"

"আপনার দিদি কে?"

"বিমলা দিদি।"

"ও—আপনি মাসীমার বোন্, আসুন—আসুন," বলিয়া দাসী হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল,"মাসীমা, তোমার বোন্ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, শীগগির নেমে এস।"

বিমলা তখন বিতলের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ভিজা চুল শুকাইতে-

ছিলেন, দাসীর কথায় চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার বোন্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে! বিমলার আপনার ভগিনী ছিল না, তবে কি মৃণালিনীরা পুরীতে আসিয়াছে। মৃণালিনী তাঁহার মামাতো-ভগিনী। তিনি দ্রুতপদে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই রে, কোথায়?" দাসী হাসিয়া বলিল, "কেন, দেখতে পাচ্ছ না? এই যে উনি," বলিয়া হেমাঙ্গিনীকে দেখাইয়া দিল। বিমলা আরও অধিক বিস্মিত হইলেন,—হেমাঙ্গিনীও অবাক হইয়া বিমলাকে দেখিতে-ছিল। নেত্যদিদি বলিয়াছিল, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মত রূপ; সে কথা মিথ্যা নয়। সে সতীনের সহিত বিবাদ করিবে স্থির করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বিমলাকে দেখিয়া তাহার ক্রোধ দূর হইয়া গেল, বিমলার বিষাদ-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল; সে বলিল, "তুমি আমার দিদি।"

"তুমি কে বোন্, আমি ত তোমায় চিন্‌তে পাচ্ছি না।"

"আমি হেমা—তোমার ছোটবোন্।"

হেমাঙ্গিনীর মুখে হেমা নাম শুনিয়া বিমলা চমকিত হইল—স্বামীর নিকট হেমাঙ্গিনীর নাম শুনিয়াছিল, এক্ষণে "আমি হেমা" শুনিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার সতীনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। সে অগ্রসর হইয়া হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া "এস দিদি, এস" বলিয়া আগ্রহসহকারে তাহাকে সঙ্গে লইয়া উপরে গেল এবং হেমাঙ্গিনীকে আপনার শয্যায় বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তুমি কেমন করে আমার কথা জানতে পারলে,

আমি ত তোমার কাছে আমার কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম।”

“তিনি প্রকাশ করেন নি, আমি অন্যরূপে জান্‌তে পেরেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে—আর তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছি।”

“আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে!”

“হাঁ দিদি, আমি ত আগে জান্‌তাম না যে, আমার একজন দিদি আছেন; কিন্তু যখন তা জান্‌তে পেরেছি, আর আমি একলা থাকবো কেন, তাই তোমাকে নিতে এসেছি।”

“তুমি নিজে ইচ্ছে করে আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে এসেছ!”

“আমি সতীন বলে কি আশ্চর্য্য হচ্চ দিদি?”

বিমলা লজ্জিত হইয়া বলিল, “না—না, তা নয়।”

“তাই দিদি, আমি সতীন, তাই আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু তুমি—তুমি কি দিদি সতীন আছে জানতে পারলে আমার মনে কষ্ট হবে বলে তুমি স্বামীকে আমার সংবাদ পর্য্যন্ত দিতে নিষেধ করেছ, সে কি আশ্চর্য্য নয়! সে কি সতীনের কাজ! তা’হলে আমি তোমাকে নিতে এসেছি বলে তুমি আশ্চর্য্য হচ্চো কেন?”

“না—না, তা নয়, আমি আশ্চর্য্য হই নি, কিন্তু—”

“না দিদি ও কিন্তু টিন্তু আমি শুনব না, বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তুমি এখনি আমার সঙ্গে বাড়ী এস।”

বিমলা সম্মত হইল না, কিন্তু হেমাঙ্গিনী নাছোড়, সে বিমলাকে সঙ্গে না লইয়া বাটী যাইবে না। বিমলা বলিল, “আমি বিবেচনা

করে দেখি, পরে যা হয় বল্‌বো।" কিন্তু হেমাঙ্গিনী কোনমতে বিমলাকে সঙ্গে না লইয়া বাটী যাইতে অসম্মত হইল। অগত্যা বিমলা কল্য যাইবে বলিয়া হেমাঙ্গিনীকে বিদায় দিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইক্ষুদ্বীপের বন্দরে জাহাজ উপস্থিত হইলে, সেস্থানের এজেন্ট সাহেব কুলিগণকে বণ্টন করিয়া, ইক্ষু-বণিকদিগকে প্রদান করিলেন; তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আবাদে প্রেরিত হইল। প্রত্যেক আবাদে এক একটি কুলিপল্লী বা কুলিদিগের আবাসস্থানে কুলিদিগের বাসের জন্য পঞ্চাশ ফুট লম্বা, বিশ ফুট চওড়া ইষ্টক ও মৃত্তিকানির্ম্মিত এক একখানি বৃহৎ অনতিউচ্চ গৃহ। প্রত্যেক গৃহই দশটি করিয়া কামরায় বিভক্ত,—প্রত্যেক কামরায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিন জন করিয়া কুলী থাকিবার নিয়ম, কেবল যাহারা সস্ত্রীক গিয়াছে, তাহাদের জন্য প্রত্যেক কামরায় দুইজন থাকিবার নিয়ম। একটি করিয়া প্রবেশ-দ্বার ভিন্ন সে সমস্ত কামরায় আর অন্য দ্বার-জানালা নাই; আলোক ও বাতাসের জন্য ছাদের উপর খোলা পরল, বৃষ্টি হইলেই সে সমস্ত পরল দিয়া কামরার মধ্যে বৃষ্টি পতিত হয়। এই নিমিত্ত বর্ষাকালে তাহাদিগকে যে অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সকলে সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। রাত্রি তিনটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া রন্ধন করিয়া লইয়া প্রাতে পাঁচটার সময় ক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে। সেখানে সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া কার্য্য করিতে হইবে, সন্ধ্যার সময় ছুটি হইলে, তাহাদিগের গৃহে ফিরিয়া আসিতেই রাত্রি নয়টা বাজিয়া যায়, ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ

হইয়া পরল দিয়া জল পড়িয়া উনান নিবিয়া গেল, শয্যা ভিজিয়া গেল, সমস্ত রাত্রি অনাহার ও অনিদ্রায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাটাইতে হইল—পরদিন পাঁচটার সময় পুনরায় ক্ষেত্রে গমন করিয়া পশুর কার্য্য করিতে হইবে। নানাপ্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টে অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের অনুভবশক্তি, চিন্তাশক্তি, সদসৎ বিবেচনাশক্তি প্রভৃতি—পশুর সহিত মানবের স্বভাবজাত পার্থক্য-গুলি—ক্রমশঃ শিথিল হইয়া, অবশেষে একেবারে লয় হইয়া গিয়া, তাহারা নরাকার অদ্ভুত পশুর মধ্যে পরিগণিত হয়।

রামেশ্বর প্রভৃতি ১৮০ জন কুলি ও ১৫জন মেট লইয়া সর্দ্দার মেট তাহের খাঁ, হগ সাহেবের আবাদে গমন করিলেন। ইক্ষু-দ্বীপে উপস্থিত হইবার পরে ছয়মাস কাল কুলিদিগকে বণিক-দিগের ভাণ্ডার হইতে রসদ দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা-দিগকে এক সপ্তাহের বলিয়া যে রসদ দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাদের পাঁচদিনের অধিক চলে না, সুতরাং প্রথম সপ্তাহে পাঁচদিনের মধ্যেই কুলিদিগের রসদ ফুরাইয়া গেল। ষষ্ঠ দিবসে তাহারা রসদের জন্য ভাণ্ডার-গৃহে গমন করিলে মেটেরা তাহাদিগকে বেত্রাঘাত-রসদ প্রদান করিয়া দূর করিয়া দিল। সমস্ত দিন অনাহারে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার পরে আহারের পরিবর্ত্তে বেত্রাঘাতে তাহাদের পৃষ্ঠোদর পরিপূর্ণ হইল। পরদিনও সেইরূপভাবে—তবে বেত্রাঘাত বাদে কাটিল! পরপর দুইদিন অনাহারে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তৃতীয় দিবসে অধিকাংশ কুলিই শয্যা-গ্রহণ করিল, সে দিন কার্য্য বন্ধ—রবিবার। এই দিবস আবার তাহাদিগকে রসদ প্রদান করা

হইল। অনেকে উদরের জ্বালায় কাঁচা চাউল চিবাইয়া কিয়ৎ-পরিমাণে জঠরানল নিবৃত্তি করিতে লাগিল। তাহারা এবারে ঠেকিয়া শিখিয়াছে, সুতরাং উদর-পূর্ণ করিয়া আহার করিতে আর কাহারও সাহস হইল না।

রামেশ্বরের কখন কায়িক পরিশ্রম অভ্যাস ছিল না। তাহার পরে তিনি দাদনের টাকা লইয়া যে মৌতাতের সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা নিঃশেষ হইয়াছে, তাহার উপর দুই দিন উপবাস। রামেশ্বর একেবারে শয্যা-গ্রহণ করিলেন। তথাপি জঠরের গুরু-তাড়নায় রসদ লইয়া আসিলেন; কিন্তু পরদিবস তিনি ক্ষেত্রের কার্য্যে গমন করিতে পারিলেন না; এজন্য সন্ধ্যার সময় মেটের হস্তে তাঁহার কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম জলযোগের ব্যবস্থা হইল, সুতরাং অসমর্থ হইলেও উত্তম-মধ্যমের ভয়ে—বাঙ্গলা দেশে এখনও প্রবাদ আছে,নীল-কুঠিয়াল সাহেবগণ শ্যামচাঁদ নামে যে উত্তম-মধ্যম দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শুনিলে লোকে ভয়ে দিশেহারা হইত—রামেশ্বর তৎপরদিবস ক্ষেত্রে গমন করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অর্দ্ধেকও সম্পন্ন করিতে পারিলেন না। এ সপ্তাহে কামাই ও অর্দ্ধকর্ম্মাদি বাদ দিয়া মোটের উপর তাঁহার পাঁচদিনের কার্য্য হইল, সুতরাং পর সপ্তাহে রসদ দিবার সময়ে তাঁহাকে সাতদিনের মধ্যে দুইদিন কামাই বাদে পাঁচদিনের রসদ দেওয়া হইল। অতঃপর রামেশ্বরের অদৃষ্টে অর্দ্ধাশন ভিন্ন ছয় মাসের মধ্যে আর কখন উদরপূর্ণ করিয়া আহার হয় নাই।

যাহা হউক, এই ছয়মাসে রামেশ্বরের কায়িক পরিশ্রম ও অর্দ্ধাশনের শিক্ষানবিশী শেষ হইয়া গেল। রামেশ্বর উভয় বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। সপ্তম মাস হইতে, রসদ বন্ধ হইয়া গেল; চুক্তি-কার্য্যানুসারে তাহারা প্রতি সপ্তাহে নগদ মজুরী পাইতে আরম্ভ করিল। পূরা চুক্তি-কার্য্য করিতে পারিলে চারি টাকা আন্দাজ মজুরী হইতে পারে। সপ্তাহের খোরাকীও তিনটাকার উপর পড়ে; কিন্তু সুস্থ কার্য্যক্ষম সবল ব্যক্তি ব্যতীত, কেহই পূরা কার্য্য করিতে পারে না; ইহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এতদ্ভিন্ন অতি অল্পসংখ্যক লোকেই খোরাকীর টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিত, অবশিষ্ট অধিকাংশ কুলিই ছয়-আনা হইতে দশ-আনা আন্দাজ মজুরী উপায় করিতে পারিত। অল্পদিনের মধ্যে রামেশ্বরের ও অন্যান্য অনেকের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা ক্ষেত্রের কার্য্য করিতে অসমর্থ হইল; তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত লঘু পরিশ্রমের কার্য্য প্রদত্ত হইল। রামেশ্বরকে কষাইয়ের দোকানে কার্য্য করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বর সে কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় অবাধ্যতা-অপরাধে তাহার শ্রীঘর-বাসের আদেশ হইল। কারাগৃহের অবস্থা আরও শোচনীয়—রামেশ্বরকে ডাক্তার অধিক পরিশ্রমের কার্য্যে অসমর্থ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। জেলের কর্ত্তা তাহাকে ময়লা পরিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রামেশ্বর আর কি করিবেন, জমাদারের বেতের আস্বাদ পাইয়াছেন —উপায় নাই, কাজ করিতেই হইবে, অধিকন্তু তাহার উপর বেত খাইতে হইবে, সুতরাং রামেশ্বর আর দ্বিধা না করিয়া ময়লা পরি-

ষ্কার করা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিন মাস পরে এই কার্য্যে তাঁহার ছুটি হইল। এখন তিনি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন, সুতরাং পুনরায় ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

তিন বৎসর পরে কোন কারণে হগ সাহেব পঞ্চাশ জন কুলিকে অন্য বণিকের আবাদে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিলে, তাহাদিগের লোক আসিয়া কুলী পরীক্ষা করিয়া রামেশ্বর প্রভৃতি পঞ্চাশজনকে পছন্দ করিল, ইহাদের মধ্যে ত্রিশ জন পুরুষ এবং কুড়ি জন স্ত্রীলোক ছিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ-কুলিকে স্ত্রীর সহিত এবং কতকগুলি স্ত্রী-কুলিকে স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া, ভিন্ন আবাদে পাঠান হইল; হতভাগ্য ও হতভাগিনীগণ একসঙ্গে থাকিবার বা গমন করিবার জন্য অনেকে কান্নাকাটি করিল, কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনে হগ সাহেব কর্ণপাতও করিলেন না; চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহারা পতি-পত্নীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল, নির্ব্বিকারচন্দ্রও এই সঙ্গে স্থানান্তরিত হইলেন।

যে কুড়িটি কুলি-রমণী ভিন্ন আবাদে প্রেরিত হইল, তাহার মধ্যে মাহুয়া নামে একটি যুবতী কুলি-রমণী ছিল। তাহাকে তাহার স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মাহুয়া সুন্দরী না হইলেও নিতান্ত কুৎসিতা নহে। তাহার স্বাস্থ্যও ভাল, সুতরাং সে নূতন আবাদে আসিয়া ওভারশিয়ার বোল্টন সাহেবের নজরে পড়িল। বোল্টন সাহেবের ইঙ্গিতে প্রথমে মেটেরা তাহাকে স্বল্প পরিশ্রমের কার্য্য দিয়া ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বোল্টন সাহেবের অঙ্কশায়িনী করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত

হইল না দেখিয়া তাহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার হইতে লাগিল। তাহাকে পুরুষ-কুলীর কার্য্য করিতে দেওয়া হইল এবং বোল্টন সাহেবও তাহার প্রতি অশেষ প্রকার কুৎসিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই তাহাকে তাঁহার কু-প্রস্তাবে সম্মত করিতে না পারায় সাহেব অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। হগ সাহেবের আনীত কুলি-রমণীগণকে দুই দুই জন করিয়া কুলিগৃহের এক একটি কামরায় থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। একদিন মাহুয়া রাত্রিকালে আবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,তাহার সঙ্গিনী স্ত্রী-লোকটি গৃহে নাই। সে প্রথমে মনে করিল, কি কার্য্যের জন্য বোধ হয় সে বাহিরে গিয়াছে। সে রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া ভাত চড়াইল, কিন্তু অন্যান্য গৃহ হইতেও সে কাহারও কোন সাড়া-শব্দ পাইল না। তাহার সন্দেহ হইল। সে প্রথমতঃ তাহার পার্শ্বস্থ গৃহের সম্মুখে যাইয়া দেখিল,সে গৃহের দ্বারে তালা বন্ধ; তৎপরে সে দেখিল, গৃহের সমস্ত কুটরীরই তালা বন্ধ,কোন কুটরীতেই কেহ নাই; তাহার অত্যন্ত ভয় হইল, সে ক্ষিপ্র হস্তে রন্ধন সমাপ্ত করিয়া সত্বর আহার করিয়া গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া শঙ্কিতমনে শয়ন করিল। গভীর রাত্রিতে একটি ভয়ঙ্কর শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; সে দেখিল, গৃহের অর্গল ভগ্ন করিয়া কে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে! সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। "চুপ, শুয়ার কি বাচ্ছা" বলিয়া তাহাদের ওভারসিয়ার বোল্টন সাহেব তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু মাহুয়া চীৎকারের উপর চীৎকার করিতে লাগিল। বোল্টন সাহেব লাথি মারিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিবার জন্য

চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সে প্রাণপণে বস্ত্র জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে কুলি-পল্লী জাগরিত হইল, নির্ব্বিকার প্রভৃতি কয়েকজন কুলী দৌড়িয়া তাহার গৃহের দিকে আসিল। বোল্টন সাহেব অগত্যা বিফলমনোরথ হইয়া, মহুয়াকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। মাহুয়া পরদিবস এজেন্ট সাহেবের নিকট বোল্টনের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল; এজেন্ট সাহেব তাহার অভিযোগ গ্রহণ করিলেন না। তখন সে আদালতে নালিশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল, কিন্তু সে, সে অনুমতিও প্রাপ্ত হইল না। এজেন্ট সাহেবের অনুমতি না লইয়া নালিশ করিতে গেলে, আদালতের ফি সাড়ে সাত টাকা দিতে হয়। হগ সাহেবের আবাদ হইতে যে পঞ্চাশ জন কুলি আসিয়াছিল, তাহারা চাঁদা করিয়া গোপনে টাকা তুলিল এবং মাহুয়াকে দিয়া বোল্টন সাহেবের নামে আদালতে অভিযোগ করিল।

বিচারের দিনের পূর্ব্ব দিনে সেই কুলিপল্লীর সমস্ত কুলিকেই দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন আবাদে পাঠান হইল, কেবল জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় নির্ব্বিকার সেই পল্লীতে রহিলেন।

বিচারক মাহুয়াকে সাক্ষী আনয়ন করিতে বলিলেন। সে বলিল, সে সাক্ষী কোথায় পাইবে; বোল্টন সাহেব সমস্ত কুলিকেই এখান হইতে অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছেন, একজন মাত্র জ্বরের জন্য যাইতে পারে নাই, কেবল সেই এখানে আছে। বিচারক নির্ব্বিকারকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন, নির্ব্বিকার আসিল এবং মাহুয়ার অভিযোগ সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিল।

বোল্টন সাহেব বলিলেন,—অভিযোগ মিথ্যা, এই শালা বাঙ্গালী-লোক বড় মিথ্যাবাদী ও বদমায়েস আছে,—এই, ঐ মাগীকে দিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে; সুতরাং বিচারে মিথ্যা নালিশ করার জন্য মাহুয়ার এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য নির্ব্বিকারের তিন মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই কারাদণ্ডেই নির্ব্বিকারের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল। মিঃ চন্দ্র—আমরা মিঃ চন্দ্রকে শ্রীশচন্দ্রই বলিব—শ্রীশচন্দ্র ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সহিত কারাগৃহ পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে নির্ব্বিকারকে দেখিয়া তাহাকে ভদ্র-সন্তান বলিয়া তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ হইল। নির্ব্বিকার তখন কয়েদীদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন। পরিবেশনান্তে জমাদার আসিয়া নির্ব্বিকারকে বলিল, সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। নির্ব্বিকার আসিলে শ্রীশচন্দ্র তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে নির্ব্বিকার উত্তর করিল, পূর্ব্বে তাহার নাম নির্ব্বিকারচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিল—এখন শুধু নির্ব্বিকার।

শ্রীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কারাদণ্ড হলো কেন?"

"সত্যকথা বলেছিলাম—সেই অপরাধে।"

"তুমি কি আমার সহিত পরিহাস করছো?"

"আজ্ঞা, সত্যকথা বলে জেলে এসেছি, সেই সত্যকথা যে আপনার কাছে পরিহাস বলে বোধ হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! যে দিন আড়কাটীর কুহকে ভুলে কুলির দলে নাম লিখিয়েছি, সেই দিন হতেই সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি" বলিয়া নির্ব্বিকার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

"সত্যকথা বলায় তোমার কারাদণ্ড হল, তার কারণ?"

"আমি সামান্ত কুলি, বিচারপতি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন, না শ্বেতাঙ্গ ওভারসিয়ারের কথা বিশ্বাস করবেন; সুতরাং ফরিয়াদী ও সাক্ষী মিথ্যা নালিশ করবার জন্ত এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্ত উভয়েই দণ্ডিত হলো।"

নির্ব্বিকার ও মাহুয়ার নাম লিখিয়া লইয়া শ্রীশচন্দ্র বাহিরে আসিলেন, এবং একজন উকিলের প্রতি ইহাদের মোকদ্দমার অনুসন্ধানের ভার প্রদান করিলেন। অনুসন্ধানের ফলে শ্রীশচন্দ্র প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলেন। ব্রাহ্মণের জন্ত তাঁহার মনে কষ্ট হইল, তিনি কুলি-বণিকের নিকট হইতে নির্ব্বিকার এবং মাহুয়াকে চাহিয়া পাঠাইলেন। কুলি-বণিক সম্মত হইয়া ইহাদের নিকট দাদন প্রভৃতি বাবদ পাওনা টাকার হিসাব পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীশচন্দ্র হিসাবের পাওনা টাকা শোধ করিয়া দিলেন, নির্ব্বিকার এবং মাহুয়া এক্ষণে তাঁহার হইল। কারামুক্তির পরে নির্ব্বিকার ও মাহুয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট প্রেরিত হইল। নির্ব্বিকারের নিকট শ্রীশচন্দ্র আদ্যোপান্ত তাহার সমস্ত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, তাহাকে কুলির কার্য্য হইতে মুক্তিদান করিয়া, ভদ্রলোকের মত নিজের নিকট রাখিলেন, এবং মাহুয়ার ক্রন্দনে শ্রীশচন্দ্র তাহার স্বামীকেও হগসাহেবের নিকট হইতে আনয়ন করিলেন। মাহুয়া ও তাহার স্বামী ভিখা, শ্রীশচন্দ্রের দাসী ও ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

চেষ্টা করিলে ইক্ষুদ্বীপ হইতে অনেক কুলি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, নির্ব্বিকারের নিকট এই কথা শুনিয়া, ষ্টুয়ার্ট সাহেব শ্রীশচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া, নির্ব্বিকারকে চুক্তিমুক্ত কুলি-সংগ্রহের

কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরে, ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীকে আর ভারতবর্ষ হইতে কুলি আনয়ন করিতে হয় নাই। যে আবাদে যে কুলির চুক্তি ফুরাইত, কোথা হইতে নির্ব্বিকার আসিয়া তাহাদের সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর আবাদে লইয়া যাইতেন। ক্রমে ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর আবাদে চুক্তিবদ্ধ কুলি অপেক্ষা চুক্তিমুক্ত কুলির সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল; ইহারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও ন্যায্য মূল্যে রসদাদি প্রাপ্ত হইত। এখানে তাহাদের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বা অন্য কোন অত্যাচার হইত না। তাহারা এস্থলে নিজের কার্য্যের ন্যায় মনে করিয়া মনোযোগ ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিত, সুতরাং নূতন ব্যবসায়ী হইলেও অল্পদিনের মধ্যে ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানী ইক্ষুদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হইলেন; অন্যান্য বণিকদিগের তুলনায় তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্যও অনেক অধিক হইতে লাগিল। নির্ব্বিকারের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব এবং শ্রীশচন্দ্র বিশেষ প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে আবাদের পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নির্ব্বিকার কর্ম্মক্ষম, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র এবং শিক্ষিত, সুতরাং সুযোগ পাইয়া নির্ব্বিকার আপনার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিল। কয়েক বৎসর কুলির কার্য্য করিয়া পরিশ্রমে তাহার বিরক্তি ছিল না, সে কখনই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিত না। নির্ব্বিকারের কার্য্য দেখিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলিয়াছিলেন, "মিঃ চন্দর, আমি বিবেচনা করি, নির্ব্বিকারের মূল্য তোমাকে ও আমাকে লইয়া সমান।"

কয়েক বৎসর পরে শ্রীশচন্দ্র একদিন নির্ব্বিকারকে বলিলেন, "নির্ব্বিকার, তোমার কি দেশে যাইতে ইচ্ছা হয় না ; তোমার কি সেখানে কেহ নাই ?"

"যখন কুলি হইয়া আসিয়াছিলাম, তখন সব ছিল, কিন্তু এখন আমিই নাই—সুতরাং আমার আর কেহ আছে, না আছে, সংবাদ লইবারও প্রয়োজন নাই ।"

"তুমি নাই কি ?" শ্রীশচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাই কি ?"

"যেদিন কুলি-ডিপোতে আমাকে অখাদ্য খাওয়াইয়া জাতিধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিল, সেইদিন হইতেই আমি নাই। তাহার পরে ইক্ষুদ্বীপে আসিয়া মানবের ধর্ম্ম,—বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি, বিবেচনা, সদসৎ বিচার সমস্তই গিয়াছিল—আমি একেবারে মরিয়া গিয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় আপনার চক্ষে পড়িয়া আমি আবার মানুষ বিবেচনা হইতেছে, কিন্তু এ আমার ছায়ার মানুষ, এ ছায়া-মানুষের সহিত কায়ার মানুষের কোন সম্বন্ধ নাই। চুক্তিবদ্ধ কুলি-জীবনের দাসত্ব মোচন করাই আমার এ ছায়া-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমি নিজে যাহা ভোগ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয় যে, এই চুক্তিবদ্ধ কুলিদিগের অপেক্ষা গৃহপালিত পশুরাও সুখী। এই কুলিপ্রভু ইক্ষুবণিকেরা—ইহারা কি মানুষ ! ইহারা সভ্যজাতি, কিন্তু অর্থের জন্য ইহারা কি না করিতে পারে—অবশ্য আমার বর্ত্তমান প্রভু ষ্টুয়ার্ট সাহেবের কথা বলিতেছি না, তিনি দেবতা।"

"তুমি কেন একবার বাটী বেড়াইয়া এস না।"

"আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, এ মুখ আর আমি আমার পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের নিকট দেখাইতে পারিব না। অত্যাচারপীড়িত ঘৃণিত কুলি-জীবনের কাহিনী আমি আর কাহারও নিকট বর্ণনা করিতে চাহি না ; আমি এইস্থানে থাকিয়া, যদি ভগবান মুখ তুলিয়া চাহেন, কুলিজীবনের এই দুঃসহ অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবিধানের চেষ্টা করিব,—এই কার্য্যের জন্যই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।"

"তুমি কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করিবে ?"

"ভগবান আমাকে আপনাদের নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই উপায় দেখাইয়া দিবেন।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

দুর্গানাথবাবু, গৃহিনী এবং নেত্য সকলেই মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। বেলা আটটার সময়ে হেমাঙ্গিনী মুরারিকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র-স্নান করিতে গিয়াছে, এগারটা বাজিল, এখনও তাহারা ফিরিয়া আসিল না! রাধুকে তাহাদের সংবাদ জানিবার জন্য সমুদ্রের ঘাটে পাঠান হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তাহারা সেখানে নাই। এই সময়ে সুধাংশুবাবু স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন কিন্তু তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরুণ বলিলেন, "এই যে বাবা সুধাংশু—বাবা, হেমা আর মুরারি সকালে আটটার সময় স্নান করিতে যাই বলিয়া, সমুদ্রের ঘাটে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।"

"কই, সমুদ্রের ঘাটে ত আমি তাদের কাহাকেও দেখতে পাই নাই। আমি ত সকাল থেকে স্নানের ঘাটেই ছিলাম।"

"তা হলে তারা কোথা গেল, বাবা ?"

সুধাংশুকুমার চিন্তিতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি ত জানি না।"

রাধু এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "তাঁহারা নরেন্দ্র-পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছে।" রাধুর কথা শুনিয়া সুধাংশুকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি প্রকারে জানিতে পারিল। রাধু তাহাতে উত্তর করিল, সেই ত মাদিগকে গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া দিয়াছে;

তাহাদিগকে গাড়ীতে উঠিয়া সেইদিকে যাইতে দেখিয়াছে। সুধাংশু-কুমার বলিলেন, "নরেন্দ্র পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেলেই বা এত বিলম্ব হবে কেন?" হেমাঙ্গিনীর মাতা বলিলেন, "তাই ত বাবা, বিদেশ বিভূঁই জায়গা, তারা দুজনেই ছেলেমানুষ, আমার বড় ভাবনা হয়েছে।" দুর্গানাথবাবু এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই; তিনি এক্ষণে বলিলেন, "অত ভাবনা কেন, মুরারি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে, সে ত আর খোকা নয়, তবে খোঁজ নেওয়া আবশ্যক। সুধাংশু, তুমি বাবা আর ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থেক না, কাপড়টা ছেড়ে ফেলে একটু কিছু মুখে দিয়ে নাও, রেধো ততক্ষণ একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আসুক।"

সুধাংশুকুমার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরশাশুড়ীও ভিতরে গেলেন। রাধু গাড়ী ডাকিতে গেল; অল্পক্ষণ পরে একখানি গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর শব্দে সুধাংশুকুমার বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—কণিকাসুন্দরীর গাড়ী, আর সেই গাড়ীর মধ্যে হেমাঙ্গিনী ও মুরারি—তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে হেমাঙ্গিনী ও মুরারি গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। কোচওয়ান, জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী নিয়ে যাই হুজুর?" মুরারি "হাঁ" বলিয়া হেমাঙ্গিনীর সহিত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই রাধুও গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিল; দুর্গানাথবাবু বলিলেন, "চল, তবে আমরাও সমুদ্রে স্নান করে আসি; মুরো, স্নান করেছিস্?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তুইও আমাদের সঙ্গে আয়" বলিয়া দুর্গানাথবাবু গৃহিণী ও পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গেলেন।

হেমাঙ্গিনী আসিয়া সুধাংশুকুমারের নিকট দাঁড়াইল, তখন সুধাংশুকুমারের চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "তোমাদের এত বিলম্ব হলো কেন?"

"তোমার যদি প্রত্যহ রাত চারটে থেকে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত স্নান করতে লাগে, আমাদের আর এমন কি বেশী বিলম্ব হয়েছে?"

হেমাঙ্গিনীর কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে লজ্জিত হইলেন, কিন্তু তিনি সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "আমি প্রত্যহ সকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াই, পরে ঝাউগাছতলায় বসে বসে সমুদ্রের ভাব দেখি আর সেই সঙ্গে ওজনবায়ুও সেবন করা হয়, পরে স্নান করি, তাই অত বিলম্ব হয়।" হেমাঙ্গিনী কণিকাসুন্দরীর গাড়ী কোথায় পাইল, জানিবার জন্য সুধাংশুকুমারের অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার লজ্জা হইল, তিনি গৌণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ও গাড়ী কোথায় পেলে?"

হেমাঙ্গিনী যেন কিছু জানে না, এইভাবে উত্তর করিল, "কোন্ গাড়ী?"

"যে গাড়ীতে তোমরা ফিরে এলে?"

"ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"ও ত ভাড়াটে গাড়ী নয়, ঘরের গাড়ী।"

"হবে।" কুটিল কটাক্ষে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হেমাঙ্গিনী স্মিতমুখে বলিল, "হবে।"

হেমাঙ্গিনীর রঙ্গ সুধাংশুকুমারের তেমন মুখরোচক হইল না। তিনি একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "হেমা!"

হেমাঙ্গিনীও ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিল, "কেন?"

হেমাঙ্গিনীর মুখে সরলতামাখা দুষ্টামির হাসি ও নয়নে আনন্দের জ্যোতিঃ দেখিয়া সুধাংশু তাহাকে যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, বলিতে পারিলেন না। হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল,—

"আমাকে লুকিয়ে তোমার কি কিছু লাভ হয়েছে?"

সুধাংশুকুমার চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি?"

"মনে করে দেখ, আমার নিকট কিছু লুকিয়েছ কি না!"

"কই, আমি ত তোমার নিকট কিছু—"

"দেখ মিথ্যা কথা বলো না বলছি—আমি সব জানি।"

সুধাংশুকুমারের ভয় হইল—হেমা কি বিমলার কথা জানিতে পারিয়াছে? কিন্তু কেমন করিয়া জানিল—না জানিলেই বা কণিকা-সুন্দরীর গাড়ী কোথায় পাইল?

সুধাংশুকুমার সহসা কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, "আর লুকিয়ে কি হবে; আমি দিদিকে দেখে এসেছি।"

আর্ত্তস্বরে সুধাংশু বলিয়া উঠিলেন, "হেমা!"

হেমাঙ্গিনী দুই হস্তে সুধাংশুকুমারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া

তাহার মুখের দিকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া কহিল, "আমি কি মানুষ নই ? আমি কি তোমার স্ত্রী নই ? তুমি সর্ব্বদাই অন্যমনা,কোন বিষয়ে তোমার মনোযোগ নাই, যেন উদাস উদাস ভাব, আমি কি পাষাণ যে, আমি তোমার এইরূপ ভাব দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব !"

সুধাংশুকুমার কি বলিবেন—তাঁহার বলিবার কিছুই নাই। তিনি অপরাধী, বিমলার নিকট অপরাধী, হেমাঙ্গিনীর নিকট অপরাধী। বিমলার নিকট যে অপরাধ, তাহাতে তাঁহার দোষ অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু হেমাঙ্গিনীকে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই প্রতারিত করিয়াছেন, অবশ্য বিমলার অনুরোধে। বিমলার কথা হেমা জানিতে পারিয়াছে কিন্তু সে তাহাতে ক্রোধ বা অভিমান করে নাই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সতীনকে দেখিতে গিয়াছিল। তিনি স্বামী হইয়া তাহাদের যে দুঃখ বুঝিতে পারেন না,তাহারা সপত্নী হইয়া পরস্পরের সেই দুঃখ বুঝে ! অনেক ভাগ্য না করিলে, এরূপ দুই পত্নী কখনও কাহারও অদৃষ্টে মিলিত হয় না। হেমাঙ্গিনী স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিল, "আমি দিদিকে আন্‌তে গিয়েছিলাম, দিদি কাল আস্‌বেন বলেছেন, তুমি আজ যখন সেখানে যাবে, দিদিকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।"

অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদ্গদস্বরে সুধাংশুকুমার বলিলেন, "হেমা, তুমি মানবী নও,—দেবী।"

"আর দিদি ? সপত্নী আছে জান্‌লে আমার মনে কষ্ট হবে, সেই জন্য আজন্ম স্বামীসুখে বঞ্চিত চিরদুঃখিনী দিদি আমার—" হেমা আর কিছু বলিতে পারিল না, স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

সুধাংশু তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি দুই হস্তে সযত্নে তুলিয়া ধরিয়া সাদরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "হেমা, হেমা, আমি যে কিছু বলতে পাচ্ছিনে হেমা, আমার কণ্ঠ যে রোধ হয়ে আস্‌ছে হেমা !"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রামেশ্বর কয়েক বৎসর পরে ঘটনাচক্রে পুনরায় আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সেই নিসি নফরচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন, বিধাতৃ-চক্রে নফর তখন বিবাহিত—ইক্ষুদ্বীপের একটি প্রহার-মৃত পিতা ও ক্ষুধা-পীড়িতা রুগ্না মাতার দশমবর্ষীয়া কন্যা হরিমতীকে—ইহারাও জাতিতে নিসি—নফরচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন হরিমতীর বয়স উনিশ কুড়ি বৎসর হইবে। সে পূর্ণা যুবতী, কিন্তু নফরচন্দ্র এক্ষণে বৃদ্ধ, তাহাতে রোগগ্রস্ত—তাহার আর এক্ষণে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। হরিমতী কার্য্য করিয়া কোনমতে তাহাদের অশনবসন সংগ্রহ করে। রামেশ্বরের গৃহের পার্শ্বের গৃহেই নফর বাসস্থান পাইয়াছিল। হরিমতী ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইত, নফর কোনমতে বসিয়া বসিয়া রন্ধন করিত। সে জাহাজে রাঁধুনী ছিল, ইক্ষুদ্বীপেও অনেকদিন রাঁধুনীগিরি করিয়াছে—সুতরাং সে এক্ষণে রন্ধনে দ্রৌপদী ইহাতে যে টুকু ব্যাকরণ-দোষ হইল, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইবেন,—রামেশ্বর নফরের দ্রৌপদীসদৃশ রন্ধনের লোভেই হউক, অথবা নফরের দ্রৌপদীরূপিণী হরিমতীর লোভেই হউক, নফরের সহিত এক সঙ্গে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে অবশ্য নফর ও হরিমতীর একটু সুবিধা হইল। দ্রৌপদীর ন্যায় রন্ধননিপুণা নফর কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শয্যাগ্রহণ করিল। তখন ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামেশ্বর ও হরিমতী দুইজনে মিলিয়া

রন্ধনাদি করিত। নফর কোন দিন খাইত, কোন দিন খাইতে পারিত না। ক্রমে তাহার অসুখ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, রামেশ্বর নফরকে হাঁসপাতালে যাইবার কথা বলিলেন, কিন্তু নফর তাহার যুবতী পত্নীকে এইরূপ অরক্ষক অবস্থায় ফেলিয়া কোনমতে হাঁসপাতালে যাইতে চাহিত না; রামেশ্বরকেই বোধ হয় তাহার অধিক ভয় ছিল। যাহা হউক, ক্রমে তাহার অসুখের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, এবং তাহাদিগের মেট তাহাকে জোর করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গেল।

পরদিবস ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন করিতে করিতে হরিমতী রামেশ্বরকে বলিল, "মেটের নিকট শুনলাম, আজ রাত্রে সর্দ্দার আমায় ডেকেছে।"

"কেন জান?"

"জানি।"

"কি করবে?"

"আমি যাব না।"

"তারপর?"

"যা হবার হবে, না হয় মাহুয়ার মতই হবে।"

"মাহুয়ার কথা তোমার মনে আছে?"

"খুব আছে, তখন আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ নই। না হয় তাই হবে।"

"সহ্য করতে পারবে?"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিমতী বলিল, "না।"

রামেশ্বর বলিল, "চল পালিয়ে যাই।"

"কোথায় যাব।"

"ষ্টুয়াটচন্দ্রের আবাদে। আমার চুক্তি নাই, তোমারও চুক্তি নাই। উপায় নাই, দেনা টাকা শোধ দিতে পারি না বলিয়া আমরা এত অত্যাচার সহ্য করছি, নহিলে এতদিন আমরা ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের আবাদে যেতাম।

"দেনার টাকা কেমন করে শোধ হবে? এদের কাছে একবার ধার করলে আর শোধ হয় না। আমি ওর বাড়াবাড়ি অসুখের সময় দশটাকা ধার করেছিলাম, তার পর তিন বৎসর প্রতি হপ্তার সিকি মজুরী কেটে কেটে দিয়ে আসছি—এখনও সে দিন বল্লে, আমার কাছে এককুড়ি পনের টাকা পাওনা।"

"বেঁচে থাকতে আর ও টাকা শোধ হবে না—আমাদেরও মুক্তি হবে না, আর মুক্তি নিয়েই বা কি হবে, কোথায় যাব—কি খাব, তার ঠিক নেই।"

অনেকক্ষণ পরে হরিমতী বলিল, "তা হলে কি করবো বল।"

"পালিয়ে যাওয়া ভিন্ন আর অন্ত উপায় নেই।" রামেশ্বর ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের কথা জানিতেন, ইক্ষুদ্বীপের সকল কুলিই জানিত, এবং চুক্তি ফুরাইলে ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিত। রামেশ্বরও সেখানে গিয়াছিল, কিন্তু ছোট সাহেবের কণ্ঠস্বরে রামেশ্বর তাঁহাকে চিনিতে পারে সুতরাং রামেশ্বর পলায়ন করে। এক্ষণে হরিমতীর বিপদের কথা চিন্তা করিয়া রামেশ্বর ভাবিল, শ্রীশবাবু আমাকে কখনই চিনিতে পারিবেন না; আর যদি পারেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি—আমি না হয় পুনরায় ফিরিয়া আসিব—হরিমতী বাঁচিয়া যাইবে।

হরিমতী এই সময়ে ভাত নামাইবার উদ্যোগ করিতে করিতে বলিল, "তবে তাই, কিন্তু কেমন করে যাব ?"

রামেশ্বর বলিলেন, "সে ব্যবস্থা আমি করছি, তুমি ভাত ঝুড়িতে ঢাল, ফেন ঝরে যাক্, তার পরে কাপড়ে ভাতগুলো বেঁধে নিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি। এখনি যেতে হবে, ভাত রাস্তায় খেতে খেতে যাব। ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের আবাদ এখান থেকে বার কোশ; রাতারাতিই পৌঁছে যাব।"

"তাই চল, মেট হয়ত আবার এখনি আসবে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই হরিমতী কাপড়ে ভাত বাঁধিয়া রামেশ্বরের নিকট দিল এবং ভাঁড়ে করিয়া এক ভাঁড় জল লইয়া বাহির হইল; হরিমতী জলের ভাঁড় মাথায় করিয়া লইল। রামেশ্বর তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভাতগুলি লইয়া চলিলেন। চৌকি-পাহারা, কুলিদিগের রন্ধন ও আহারের সময় বলিয়া অসতর্ক ছিল। তাহারা পল্লীর পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব—তিনখানি টিনের থালা, দুইটি মাটির ভাঁড় এবং একখানি শতছিদ্র জরাজীর্ণ কন্থা, দুইখানি ছিন্ন কম্বল এবং একখানি চেটাই—চেটাইখানি রামেশ্বরের। তিনি কন্থা প্রস্তুত করিতে জানেন না, যাহারা জানে, তাহাদেরই বা সময় কোথায়? রামেশ্বর চেটাইয়ের উপর মাটির ঢিপি মাথায় দিয়া শয়ন করিতেন, কম্বলখানি গায়ে দিতে হইত। জেলখানাতেও কয়েদীরা দুইখানা করিয়া কম্বল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই হতভাগ্য কুলিদের, একখানি মাত্র কিনিয়া লইবারও অর্থ নাই—পরিত্যাগ করিয়া ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের আবাদাভিমুখে প্রস্থান করিল।

দুই ঘণ্টা পরে কুলিপল্লী নিস্তব্ধ হইলে মেট হরিমতীর গৃহদ্বারে আসিয়া দরজায় হাত দিয়া দেখে দরজা খোলা; সে অনুচ্চ স্বরে "হরি—হরি" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু কোন সাড়া পাইল না। সুতরাং সে অন্ধকারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া,পদদ্বারা স্থান নির্ণয় করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটা শূন্য হাঁড়ীতে তাহার পদস্পর্শ হইবামাত্র হাঁড়ীটী গড়াইয়া গেল, আরও অগ্রসর হইতে তাহার পদে কন্থা স্পর্শ হইল; সে "হরি—হরি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কন্থার উপর আসিল, কিন্তু কন্থা শূন্য—তাহাতে হরিমতী নাই! সে তখন কন্থার চতুষ্পার্শ্বে পা দিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ তাহার পা, হরিমতীর ভগ্ন উনানের মধ্যে পড়িয়া গেল, মেট সাহেব টাল সামলাইতে পারিলেন না,অন্ধকারে উনানের উপর পড়িয়া গেলেন, দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। হরিমতীর উপর তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ হইল, তিনি ধীরে ধীরে ভূমি ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং বাসায় গিয়া তথা হইতে আলোক লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য—পাখী উড়িয়াছে! কিন্তু তিনি তখনও তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; মনে করিলেন, বোধ হয় বাহিরে গিয়াছে; সুতরাং তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্দ্দার সাহেব তাহার অনেক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে হরিমতীর গৃহে আগমন করিলেন, এবং মেটকে একাকী তথায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্ব হচ্চে কেন, সে কোথা গেল?"

"তাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না, ডেকে সাড়া পাই নি—সেইজন্য আলো নিয়ে এসেছি, কিন্তু তার তো কোন খবর নেই।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

"কোথায় গেল ?"

"মনে করেছিলাম, বোধ হয় বাইরে গিয়েছে, কিন্তু সেও তো আধ ঘণ্টার উপর হলো।"

"পালাল নাকি ?"

"অসম্ভব নয়।"

"খোঁজ কর, খোঁজ কর, অন্য মেটদের ডাক, কুলি গুণ্‌তি কর।"

সেই দ্বিপ্রহর রজনীতে কুলি-পল্লীতে হাঁকডাক পড়িয়া গেল, মেটেরা আলোক হস্তে প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক কামরায় কুলি গুণ্‌তি করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যে কেবল রামেশ্বর এবং হরিমতী ভিন্ন সকল কুলিই আছে, জানিতে পারা গেল। মেট তখন সর্দ্দারকে, রামেশ্বর ও হরিমতীর একসঙ্গে ক্ষেত্রে কার্য্য করা এবং একসঙ্গে রন্ধন ও আহারাদি করার কথা বলিলে, সর্দ্দার বলিলেন, "তবে ঠিক হয়েছে, সেই শালাই তাকে নিয়ে পালিয়েছে। তোমরা দুজন মেট ও দুজন চৌকিদার আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়, তারা ঠিক ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর আবাদের দিকে গিয়েছে, সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ধরতে পারলে ভাল হয়।"

মেট ও চৌকিদারেরা তৎক্ষণাৎ আলোক হস্তে দ্রুতপদে ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানির আবাদের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু রামেশ্বর ও হরিমতী এই তিন ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সাধ্যমত দ্রুত গমন করিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে পারিল না।

রামেশ্বর ও হরিমতী প্রথম প্রথম অতি দ্রুত গমন করিয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে হরিমতী ক্লান্ত হইয়া পড়ায় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, সুতরাং তাহারা রাত্রির মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিল না। যেস্থানে প্রভাত হইল, সেস্থান হইতে ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের আবাদ প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। প্রভাত হইতেই তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া ইক্ষুক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সীমানা হইতে অৰ্দ্ধক্রোশ দূরে আসিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া ইক্ষুক্ষেত্রেই দিনের বেলা লুকাইয়া রহিল, এবং সন্ধ্যার পরে বাহির হইয়া ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর আবাদে প্রবেশ করিল। অনুসন্ধান-কারিগণ তাহাদের কোন সন্ধান না পাইয়া রাত্রি-প্রভাতেই প্রত্যা-গমন করিয়াছিল।

———

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুধাংশুকুমার সেই দিনই বিমলাকে বাটীতে লইয়া আসিবেন, হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সেইরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু কেমন করিয়া তিনি সে প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন? বিমলা কি সম্মত হইবে? সে কি তাঁহার কথা রক্ষা করিবে? বিমলা তাঁহার পত্নী কিন্তু বিমলার উপর ত তাঁহার কোন দাবী নাই। বিমলা হেমার নিকট তাহার কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল; হেমা জানিতে পারিয়াছে। বিমলা হয়ত মনে করিবে, আমিই হেমাকে বলিয়াছি—কিন্তু হেমা কেমন করিয়া জানিতে পারিল? শ্বশুর মহাশয়ই বা হঠাৎ শাশুড়ী ঠাকুরুণকে লইয়া আসিলেন কেন? তাঁহাদের আসাও কি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট? সুধাংশু যখন মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, হেমা তাহার মাতাকে বিমলার কথা বলিয়া বলিল, "পরশুদিন তোমার পত্র পেলাম—দাদার অসুখ, তবে তোমরা কি জন্যে তাঁকে ফেলে চলে এলে?"

"তোমার জন্যে যে আমাদের মন বড় অস্থির হয়েছিল মা।"

"মন খারাপ করে কি করবো মা, আমার ভাগ্যে সতীনের সঙ্গে ঘর করা ভগবান লিখেছেন, তাই করতে হবে। তবে সতীন যদি দিদির মত হয়, আমার বোধ হয়, সতীনে-সতীনে কখন ঝগড়া হয় না।"

"শুনেছি নাকি সে বড় ভাল মেয়ে, পাছে তোমার মনে কষ্ট হয়, সেই জন্যে সে নাকি সুধাংশুকে তোমার কাছে তার কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিল।"

"আমিও সেই কথা শুনে তাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। তখন আমার মনে রাগ ছিল, আমি তার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে গিয়েছিলাম। কিন্তু মা, তার সেই মলিন মুখখানি দেখে আমার চক্ষে জল এল,—আহা মা সে বড় দুঃখী!" কন্যার কথা মাতার কর্ণে তেমন শ্রুতি-মধুর বলিয়া বোধ হইল না। তিনি ঔদাস্যের সহিত বলিলেন, "ভাল হলেই ভাল মা।"

"আমি দিদিকে আজই আনতে বলেছি।"

"ভালই করেছ।"

এই সময়ে পিতাকে আসিতে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী উঠিয়া গেল। গৃহিণীর নিকট দুর্গানাথবাবু সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহলে আমাদের আর থাক্‌বার আবশ্যক কি—চল, আমরা আজই যাই। ওদের চেনা শুনা হয়ে গেছে, ওদের ঘর-সংসার ওরা দেখে-শুনে নিক্, আমরা থাক্‌লে ওদের নানারূপ অসুবিধা হবে।" গৃহিণী সম্মত হইলেন, তিনি পীড়িত পুত্রকে বৌ-মার স্কন্ধে ফেলিয়া আসিয়াছেন।

সুধাংশুকুমার বিমলার নিকট যাইবার জন্য বাহির হইতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু দুর্গানাথবাবু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা সুধাংশু, আমরা আজই কলকাতায় ফিরে যাব, তুমি তিনটের গাড়ীতে আমাদের তুলে দিয়ে এসো, আমরা গাড়ী আনিতে পাঠিয়ে দিইছি।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুধাংশু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজই যাবেন ?"

"হাঁ বাবা, তোমাদের দেখ্‌বার জন্যে মন বড় ব্যস্ত হয়েছিল, তাই হঠাৎ চলে এসেছিলাম, আবার রাজেনের বড় অসুখ, তাকে ফেলে এসেছি—তাই থাকতে পারছিনে।"

পিতামাতা অদ্যই আবার বাটী ফিরিয়া যাইতেছেন শুনিয়া মুরারি বলিল, সেও বাটী যাইবে। সুধাংশু আপত্তি করিলেন, হেমাঙ্গিনী রাগ করিল, মাতা বুঝাইলেন, পিতা তিরস্কার করিলেন, কিন্তু মুরারি কোনমতে থাকিতে চাহিল না; অগত্যা দুর্গানাথবাবু মুরারিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সুধাংশুকুমার তাঁহাদিগের সঙ্গে ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন এবং গাড়ী ছাড়িয়া গেলে তিনি ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া কণিকাসুন্দরীর বাটীর দিকে গমন করিবার জন্য বামদিকের রাস্তা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিকের পথে অগ্রসর হইতেই হঠাৎ তাঁহার মাথা ঘুরিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, রাস্তায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহাকে রাস্তার উপরে সেই-রূপে পতিত হইতে দেখিয়া রাস্তার উপর লোক জমিয়া গেল; এবং দুইজন উৎকলবাসী ভদ্রলোক তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিয়া রাস্তার পার্শ্বে ঘাসের উপর শয়ন করাইল, দুইজন জল আনিতে ছুটিল, একজন বৃক্ষপত্র ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। তাঁহারা যে গাড়ীতে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সেই গাড়ীখানি তখন ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল, কোচম্যান

সুধাংশুকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, এবং গাড়ী থামাইয়া বলিল, "বাবুর বাড়ী আমি জানি।"

"তাহলে ভালই হয়েছে, এই গাড়ীতেই এঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যাক" বলিয়া সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল, দুইজন দয়াপরবশ হইয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া রহিল।

অচৈতন্যাবস্থায় সুধাংশুকুমারকে গাড়ী হইতে নামাইয়া শয্যায় লইয়া গিয়া শয়ন করান হইল। হেমাঙ্গিনীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; সে ভাবিল—বাবা মা থাকিলে ভাল হইত, মুরারি ছোঁড়াও এই বিপদের দিনে চলিয়া গেল, কপালে কি আছে, ভগবান জানেন। নেত্যদিদি সুধাংশুকুমারের মস্তক ও মুখে জল দিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং হেমাঙ্গিনীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি দিদি, অমন হয়ে থাকে তুমি রেধোকে সাহেব-ডাক্তারের বাড়ী পাঠাও।"

হেমাঙ্গিনী রাধুকে সাহেব ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে বলিলে সে বলিল, সে সাহেব ডাক্তারের বাটী যাইতে পারিবে না, তাহার ভয় করে। সাহেবের যে বড় বড় দুইটি কুকুর আছে, তাহারা তাহাদের দেখলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আসে। সুতরাং হেমাঙ্গিনী বিমলাকে পত্র লিখিয়া রাধুকে কণিকাসুন্দরীর বাটীতে পাঠাইলেন।

"দিদি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বাবাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় উনি পথে অজ্ঞান হইয়া পড়েন, রাস্তার লোকে

গাড়ী করিয়া তাঁহাকে বাটীতে আনিয়াছে, ডাক্তার ডাকিবার লোক নাই, আমি একা, তুমি একবার এস"—হেমাঙ্গিনী।

পত্র পাঠ করিয়া বিমলার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, সে কণিকা-সুন্দরীকে পত্র দিয়া ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ গাড়ী ডাকাইয়া রাধুর সহিত স্বামি গৃহে গমন করিল। বিমলাকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী ছুটিয়া আসিয়া দুই হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া "কি হবে দিদি" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—তাহার কান্না দেখিয়া বিমলারও কান্না আসিল, কিন্তু সে অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া হেমাঙ্গিনীর অলক্ষ্যে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"ভয় কি দিদি, ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি, অসুখ হয়েছে সেরে যাবে।" বলিয়া বিমলা হেমাঙ্গিনীকে লইয়া গিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার সাহেবকে লইয়া কণিকাসুন্দরীর একজন কর্ম্মচারী তথায় আগমন করিলেন। সাহেব রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এপোপ্লেক্সি বড় সাংঘাতিক আক্রমণ, আমি কোন আশা দিতে পারি না, তবে চেষ্টা করিতে পারি।" ইংরাজীতে কর্ম্মচারীকে এই কথা বলিয়া ডাক্তার সাহেব কাগজ কলম চাহিলেন। নেত্য কাগজ কলম আনিয়া দিল, ডাক্তার ঔষধ লিখিয়া দিয়া দর্শনী লইয়া বিদায় হইলেন, এবং গমনকালে বলিয়া গেলেন, সন্ধ্যার পরে পুনরায় রোগী দেখিয়া যাইবেন, এবং হাঁসপাতাল হইতে তিনি একজন শিক্ষিতা শুশ্রূষাকারিণীও পাঠাইয়া দিবেন।

কৃত্রিম উপায়ে সুধাংশুকুমারকে ঔষধ খাওয়ান হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না, সন্ধ্যার পরে কণিকা-

সুন্দরী, তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, ডাক্তার সাহেবও আসিলেন, কিন্তু রোগীর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন না। ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন, এবং কণিকাসুন্দরীর কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "রোগীর জীবনের কোন আশা নাই।"

ডাক্তার সাহেবকে রাত্রে থাকিবার জন্ত অনুরোধ করা হইল। তিনি বলিলেন, অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া তাঁহাকে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি থাকিলেও কোন ফল হইবে না। রাত্রির মধ্যে রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে না, তিনি পুনরায় প্রাতে আসিবেন। কিন্তু যদি রাত্রে কোন পরিবর্ত্তন চিহ্ন দেখা যায়, তাঁহাকে সংবাদ দিলেই তিনি আসিবেন। ডাক্তারের কথাই সত্য হইল, রাত্রির মধ্যে সুধাংশুকুমারের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। প্রত্যুষে পুনরায় ডাক্তার-সাহেব আসিয়া ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন; রোগীর অবস্থা সমভাবেই রহিয়াছে। শিক্ষিতা শুশ্রূষা-কারিণী থাকিতেও বিমলা কিংবা হেমাঙ্গিনী সমস্ত রাত্রির মধ্যে রোগীর শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে কণিকাসুন্দরী আসিয়া, হেমাঙ্গিনী ও বিমলাকে জোর করিয়া তুলিয়া দিয়া নিজে শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, নেত্য তাহাদিগকে স্নান করাইয়া কিছু আহার করাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারিল না; পুনরায় উভয়ে আসিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল দেখিয়া, কণিকাসুন্দরী বলিলেন, "বিমলা দিদি, তোমরা দুইজনের মধ্যে একজন ঘুমাও, দুইজন একসঙ্গে থাকিবার কোন আবশ্যক নাই, দুইজনেই একসঙ্গে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।"

বিমলা হেমাঙ্গিনীকে ঘুমাইতে বলিল। হেমাঙ্গিনী বলিল, তাহার ঘুম পায় নাই, তাহার ঘুম হইবে না, সে বিমলাকে ঘুমাইবার জন্য অনুরোধ করিল। হঠাৎ কণিকাসুন্দরীর মনে হইল, বোধ হয়, হেমাঙ্গিনীর পিতাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। তিনি হেমাঙ্গিনীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হেমাঙ্গিনী বলিল, না—তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, সে ভুলিয়া গিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ দুর্গানাথবাবুকে টেলিগ্রাম করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, কণিকাসুন্দরী নিতান্ত জিদ করিয়া বিমলাকে শয়ন করাইয়া, দ্বিপ্রহরের পরে পুনরায় আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বিমলা শয়ন করিল বটে, কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না, সে মনে মনে আপনাকে নিতান্ত দুর্ভাগিনী বিবেচনা করিয়া ভাবিতে লাগিল, বোধ হয়, তাহারই দুরদৃষ্টের ফলে স্বামীর এই সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছে!

দ্বিপ্রহরের পরে কণিকাসুন্দরী পুনরায় আগমন করিলেন। তিনি বাটী হইতে আসিবার পূর্ব্বেই বিমলা ও হেমাঙ্গিনীর জন্য দুগ্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দুগ্ধ ব্যতীত ইহাদিগকে অন্য কোন দ্রব্যই খাওয়ান যাইবে না, তিনি আসিবার পরেই তাঁহার দাসী দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত হইল, তিনি বল-পূর্ব্বক তাহাদের দুইজনকে একটু একটু দুগ্ধ পান করাইলেন, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া পুনরায় পর দিবস প্রাতে আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার সাহেব মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন, কিন্তু রোগীর কোন পরিবর্ত্তন নাই। এইরূপে দ্বিতীয় দিবসও গত হইল।

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে দুর্গানাথবাবু কলিকাতা হইতে দুইজন বড় বড় বাঙ্গালী ডাক্তার এবং একজন প্রধান ইংরাজ ডাক্তার লইয়া পুরীতে উপস্থিত হইলেন। নবাগত তিনজন ডাক্তারই রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু পুরীর সাহেব ডাক্তার তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিয়া বলিলেন, এপোপ্লেক্সিতে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া চিকিৎসা সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তিনি কোন মতেই ইহাতে সম্মত হইতে পারেন না ; স্বভাবে যদি চৈতন্য ফিরিয়া আসে মঙ্গল নচেৎ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে রোগীর মৃত্যুকে শীঘ্রই ডাকিয়া আনা হইবে ; তবে রোগীর জীবনের তিনি কোন আশা করেন না সম্ভবতঃ আজ রাত্রে রোগীর চৈতন্য হইবে। ডাক্তারের কথা শুনিয়া কলিকাতার ডাক্তারেরা সেদিন অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন, আজ যদি চৈতন্য না হয়, কাল তাঁহারা রক্ত-মোক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

পুরীর ডাক্তারের কথাই সত্য হইল, রাত্রি দশটার পরে সুধাংশু-কুমারের চৈতন্য ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাসিকা ও মুখবিবর দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল, ডাক্তারেরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। রাত্রি একটার সময় রক্ত নিঃসরণ হওয়া বন্ধ হইল ; সুধাংশুকুমারের জ্ঞান হইল, তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া প্রথমে "বিমলা" বলিয়া পরে বলিলেন, "হেমা কোথায় ?"

ডাক্তার ধাত্রী, দুর্গানাথবাবু প্রভৃতি সকলেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন ; সুধাংশু একহস্তে বিমলার হাত ধরিয়া অপর হস্তে হেমাঙ্গিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "হেমা তোমার দিদিকে

দেখ” পরে বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা, হেমা ছেলেমানুষ, তাহাকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম ; আমার দুর্ভাগ্য, তোমাদের মত স্ত্রী পাইয়াও আমি তোমাদের লইয়া সংসার করিতে পারিলাম না।” শেষরাত্রে সুধাংশুকুমার দেহত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েক দিবস হইতে রাত্রিকালে বন্য-শূকরের অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে; শূকরের দল রাত্রি হইলে পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইক্ষু ভক্ষণ করে এবং অনেক ইক্ষু ভাঙ্গিয়া নষ্ট করে, এই জন্য আজ তিন দিন হইতে কয়েক জন শিকারী ষ্টুয়ার্ট চন্দ্রের আবাদে বন্দুক হস্তে ইক্ষুক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গত রাত্রিতে সাত আটটি শূকর মারা পড়িয়াছে।

রামেশ্বর ও হরিমতী পথ ছাড়িয়া ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহারা আর পথ খুঁজিয়া পাইল না; তাহারা ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের আবাদে প্রবেশ করিয়া, কিছুদুর অগ্রসর হইতে না হইতেই ইক্ষুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া তীরবেগে ইক্ষু ভগ্ন করিয়া গাছ মাড়াইয়া, কি যেন তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে মনে হইল। তাহারা পার্শ্বের দিকে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই তিন চারিটা বন্য শূকর তাহাদের পার্শ্বদিয়া ছুটিয়া গেল, তাহার পরেই তিন চারিটা বন্দুকের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বর "বাবা গো" বলিয়া পড়িয়া গেল।

"কি হলো, কি হলো" বলিয়া হরিমতী তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। রামেশ্বর বলিল, "গুলি লাগিয়াছে—ওদিকে মানুষ আছে, ডাক।"

হরিমতী চীৎকার করিয়া ডাকিতে তাহার কণ্ঠস্বর শিকারী-দিগের কর্ণগোচর হইল; তাহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া আলোকহস্তে খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, এবং তাহারা কোথা হইতে আসিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে রামেশ্বর বলিল, তাহারা চার্টারিস্ সাহেবের আবাদ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, তাহার কোমরে গুলি লাগায় সে পড়িয়া গিয়াছে। শিকারীরা আক ভাঙ্গিয়া, একখানি চালি প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপর রামেশ্বরকে তুলিয়া কুলি-পল্লীতে লইয়া গেল, হরিমতীও নিতান্ত বিষন্ন চিত্তে তাহাদের অনুসরণ করিল। ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর প্রত্যেক কুলি-পল্লীতে এক একটি হাঁস-পাতাল ও একজন করিয়া ডাক্তার থাকিত। শিকারীরা রামেশ্বরকে একেবারে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিল। ডাক্তার আসিয়া রামেশ্বরকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রাত্রে কিছু করা যাইবে না, কাল সকালে দেখবো বলিয়া তিনি রামেশ্বরের ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া রাত্রির মত প্রস্থান করিলেন, সুশ্রূষা করিবার জন্য হরিমতী তাহার নিকট রহিল। পরদিবস দিবালোকে ডাক্তার রামেশ্বরকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, গুলি বাহির করিতে গেলে এখনই মৃত্যু হইবে, গুলি না বাহির করিলেও মৃত্যু হইবে—কিন্তু দুই এক দিন বিলম্বে। রামেশ্বর গুলি বাহির করিতে দিতে অসম্মত হইয়া ডাক্তারকে বলিল, সে একবার মিঃ চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। চমকিত হইয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ চন্দ্র!"

"আজ্ঞে হাঁ, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি তাঁর দেশের লোক, আমি তাঁহাকে কোন বিশেষ সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত যেন সাক্ষাৎ হয়।"

"সে কথা আমি কেমন করিয়া বলিব, তবে আমি সংবাদ দিতে পারি।"

"আপনি এই বলিয়া সংবাদ দিবেন যে, কলিকাতায় তাঁহার বাটীতে রামেশ্বর বাবু বলিয়া যে একটি লোক থাকিত, তাহার একটি বিশেষ কথা—সে আমাকে বলিয়াছিল, মিঃ চন্দ্রের সে কথা জানা নিতান্ত আবশ্যক।"

ডাক্তার মিঃ চন্দ্রকে সেইরূপই সংবাদ দিবেন বলিয়া রামেশ্বরের যন্ত্রণার যথাসম্ভব লাঘব করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারের পত্র পাঠ করিয়া শ্রীশচন্দ্রের রামেশ্বরের কথা স্মরণ হইল; রামেশ্বরের পত্র পাঠ করিয়া, তাঁহার সুখের নন্দন-কানন শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি জন্মের মত নষ্ট হইয়াছিল, সেই রামেশ্বরের সংবাদ পুনরায় এত বৎসর পরে এই মহা সমুদ্র পারেও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে! না—আর তিনি তাহার সংবাদ শুনিতে চাহেন না। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, রামেশ্বরের নিষ্ঠুর পত্রে, তাঁহার জীবনের আলোক নিবিয়া গিয়াছে, মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখশান্তি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। এতদিনেও সেই সাংঘাতিক আঘাতজনিত তাঁহার হৃদয়ের সে ভীষণ ক্ষত শুষ্ক হয় নাই—তাঁহার জীবনথাকিতে

হইবে না; সে আঘাত বড় নিদারুণ,বিষম মর্ম্মান্তিক—তাঁহার কণিকা সে যে তাঁহার বড় আদরের বড় স্নেহের ছিল,—তিনি এতদিনেও তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না! সে কি বাঁচিয়া আছে, সে কি সুখে আছে ভগবান জানেন! তিনি বড় ব্যথায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন—ব্যথার উপশম হইবে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন,কিন্তু কই—তাঁহার সে ব্যথা দূর হইল কই—তাহাকে ভুলিতে পারিলেন কই— এ জীবনে সে ব্যথা দূর হইবার নহে, তাহার কথা বিস্মৃত হইবার নহে। মরণে কি তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারা যাইবে? মরণে কি স্মৃতি নষ্ট হয়! কে জানে! যদি নিশ্চিত জানিতে পারিতেন, তিনি হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন। লোকে মৃত্যুযন্ত্রণায় ভয় করে কেন! প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গমন কালে হয়ত দেহের যন্ত্রণা হইতে পারে, কিন্তু সে ত অল্পক্ষণস্থায়ী—অল্পক্ষণেই দেহের অনুভূতি শেষ হইয়া যায়,কিন্তু মনের যন্ত্রণা কি দেহের অনুভূতি শেষ হইলে শেষ হয়! কে জানে! জন্মমৃত্যুর এ প্রহেলিকা জগতে কে ভেদ করিতে পারে! জন্ম কি শুধু দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত! মৃত্যু কি সে দুঃখ নিবারণ করিতে পারে!

এইরূপ নানা প্রকার মানসিক চিন্তায় অভিভূত হইয়া শ্রীশচন্দ্র নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু নিদ্রাতেও তাঁহার মানসিক চিন্তার বিরাম হইল না! তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কণিকা গললগ্ন-বাসে, কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে, পূজা সাঙ্গ হইলে সে যেন তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক রক্ষা করিয়া কাতর স্বরে

তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, "এস এস, তুমি যেখানে থাক, একবার আমাকে দেখা দিয়া যাও, তুমি মিথ্যা সন্দেহ করিয়া দারুণ মনঃকষ্ট পাইতেছ, এস দেখিয়া যাও, তোমার কণিকা অবিশ্বাসিনী নহে, সে তোমার—চিরদিনই তোমার। এস এস, বিলম্বে বুঝি আর দেখা হইবে না, আমি অনেক দিন তোমার অপেক্ষায় জোর করিয়া প্রাণ রাখিয়াছি,আর ত পারি না প্রভো—" নিদ্রা-ঘোরে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল পড়িয়া উপাধান সিক্ত হইয়া গেল, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল কিন্তু কণিকার সেই কাতর আহ্বান-ধ্বনি দিগন্ত হইতে যেন তখনও তাঁহার কর্ণে স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহার সেই করুণ আহ্বান "এস এস" তিনি যেন তখনও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন! তিনি ভাবিলেন, এ কি হইল, এতদিন পরে কি আমি সত্য সত্যই উন্মত্ত হইলাম! "কণা—কণা—শেষে কি আমাকে পাগল করলি কণা" —বলিয়া শ্রীশচন্দ্র মনের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

প্রকৃতই কণিকাসুন্দরী সেই সময়ে স্বামি-পূজা শেষ করিয়া, শ্রীশচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির পদতলে মস্তক স্থাপন করিয়া কায়মনোবাক্যে স্বামীকে আহ্বান করিতেছিলেন, তাঁহার নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া প্রতিমূর্ত্তির পদ-যুগল সিক্ত হইতেছিল—তাহার সেই ব্যাকুল আহ্বানে বায়ুমণ্ডল কম্পান্বিত হইল, সতীর সেই সন্তপ্ত অশ্রু-জলে ধরিত্রী সন্তাপিত হইলেন, তাই অনন্ত সাগরপার হইতেও শ্রীশচন্দ্র সতীর সেই কাতর আহ্বান শুনিতে পাইলেন। অনেকক্ষণ পরে শ্রীশচন্দ্র রোদন সংবরণ করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যাত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। ধীরে ধীরে উষারাণী আপনার আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরে শ্রীশচন্দ্রের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হইল, তিনি হাঁসপাতালে মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবেন স্থির করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রামেশ্বরের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বলিয়াছিলেন, গুলি বাহির না করিলে তাহার দুই তিন দিন জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা, তৃতীয় দিবস সন্ধ্যা হইতেই রামেশ্বরের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল, সে মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইতে লাগিল, যখনই তাহার জ্ঞান হয়, সে মিঃ চন্দ্র আসিয়াছেন কি না প্রশ্ন করে—কিন্তু উত্তরে "না আসেন নাই" শুনিয়া, ক্রমেই তাহার অস্থিরতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; অকস্মাৎ সে "মা মা ! মা জগদ্ধাত্রী মা কণিকা ! আমি তোমার সন্তান আমাকে মার্জ্জনা কর মা ! আমি জানতাম না—সতীর মনে কষ্ট দিলে যে জীবনে-মরণে সমান যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়—জানতাম না ; মা রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না—উহু হু হু জলে গেল, জলে গেল, বুক পুড়ে খাক হয়ে গেল—দয়া হলো না মা, এ অভাগার প্রতি দয়া হলো না মা ! এ কি এ কি ! আমার দুঃখে তুমি কাঁদছো মা ! না না, তুমি কেঁদোনা মা, এ পাষণ্ডের জন্য ও পবিত্র চক্ষের জল ফেলো না। এ কি ! এ ত চক্ষের জল নয়, এ যে শান্তিবারি মা ! আমার বুকের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল, মা আমার মাথায় তোমার ওই রাঙ্গা চরণ স্পর্শ কর মা, আমার সর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক" বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, পরক্ষণেই পরিতৃপ্তির সহিত একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "আঃ !" বলিয়া রামেশ্বর নিদ্রিত হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

রামেশ্বর ষ্টুয়ার্টচন্দ্রের যে আবাদে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল, তাহার নাম রাস্নার আবাদ, সে আবাদটি তাহাদিগের সর্ব্বশেষ আবাদ, দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তভাগে অবস্থিত; প্রত্যহ সকালে রাস্না হইতে একখানি গাড়ী ছাড়িয়া পরদিন প্রাতঃকালে বন্দরে পৌছায় আর একখানি বন্দর হইতে ছাড়িয়া পরদিবস প্রাতঃকালে রাস্নায় যায়। সে গাড়ীতে গেলে হয়ত লোকটির সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ভাবিয়া শ্রীশচন্দ্র রাস্নায় গাড়ীর পূর্ব্বে তাঁহাকে একখানি স্পেশাল গাড়ী দিতে বলিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই স্পেশাল গাড়ী শ্রীশচন্দ্রকে লইয়া নিয়মিত গাড়ী ছাড়িবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে রাস্নাভিমুখে ছুটিল। শ্রীশচন্দ্র ড্রাইভারকে 'ফুল স্পীডে' গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। ড্রাইভার প্রভুকে তাহার ক্ষমতা দেখাইবার সুযোগ পাইয়া চব্বিশ ঘণ্টার পথ ষোল ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া রাত্রি দশটার সময় রাস্নায় পৌছাইয়া দিল। শ্রীশচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়াই হাঁসপাতালে গমন করিলেন। ডাক্তার হাঁসপাতালেই ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন মিঃ চন্দ্র কখনই সামান্য কুলির কথায় তাহাকে দেখিতে আসিবেন না, এক্ষণে মিঃচন্দ্রকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি যে আসবেন, আমি আশা করি নাই, আর যদি নিতান্তই দয়াপরবশ হইয়া আসেন, আজ কখনই আসতে পারবেন না।"

"হাঁ আমি স্পেশালে এসেছি, তোমার রোগী কেমন আছে?"

"অবস্থা ভাল নয়, সন্ধ্যার সময় হইতে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, এখন একটু ঘুম এসেছে. কিন্তু প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত

তাহার জীবনীশক্তি বাহির হইয়া যাইতেছে, রাত্রি কাটিবে কি না সন্দেহ।

"চল দেখি" বলিয়া, শ্রীশচন্দ্র ডাক্তারের সহিত রোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,শয্যার উপর জীর্ণ মলিন শতগ্রন্থিযুক্ত একখানি ছিন্ন বস্ত্রে কোনরূপে লজ্জা-নিবারণ করিয়া, একটি শীর্ণকায় শুষ্ক বৃদ্ধ নিদ্রা যাইতেছে! শ্রীশচন্দ্র তাহার শয্যার নিকটস্থ হইবা মাত্র তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে চক্ষু উন্মীলিত করিতেই তাহার দৃষ্টি শ্রীশচন্দ্রের মুখের উপর পতিত হইল; সে শ্রীশচন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "আসিয়াছেন! আপনার বড় দয়া।" পরে ডাক্তারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনারা সকলে বাহিরে যান।" গৃহ হইতে সকলে বাহির হইয়া গেলে রামেশ্বর বলিল, "শ্রীশবাবু আমাকে চিন্‌তে পারেন?"

মাথা নাড়িয়া শ্রীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "না, তুমি আমাকে কি প্রকারে চিনিলে, তুমি কে?"

"আমি রামেশ্বর।" অকস্মাৎ পথ মধ্যে ফণোদ্ধৃত কালসর্প দেখিলে লোকে যেমন চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হয়, শ্রীশচন্দ্র রামেশ্বরের মুখে "আমি রামেশ্বর" কথা শুনিয়া সেইরূপ চমকিত হইয়া তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন; কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিলেন

"তোমার এ দশা কেন?"

"সতীর মনে কষ্ট দিয়াছিলাম, সজ্জনের মনে কষ্ট দিয়া তাঁহাকে দেশত্যাগী করিয়াছিলাম, তাহার ফলে এই বার বৎসর ইন্দুরোগে

কুলিগিরি করিয়াছি। তাহাতেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে মা আসিয়াছিলেন, তিনি আমার মস্তকে চরণ স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমার নরকযন্ত্রণার লাঘব হইয়াছে।" শ্রীশচন্দ্র ভাবিলেন, প্রলাপ বকিতেছে। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলে কেন?"

"আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবার জন্য, জানি আমি মার্জ্জনার উপযুক্ত নই, কিন্তু আপনি দেবতা—আমার আরও ভরসা এই যে, মা যখন আমাকে মার্জ্জনা করিয়াছেন, আপনিও আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

শ্রীশচন্দ্র কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি অপরাধ করিয়াছ যে, তোমাকে মার্জ্জনা করিব?"

"আমি মায়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"মায়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক কি? কে তোমার মা?"

"আপনার সহধর্ম্মিনী কণিকা দেবী।"

এঁ—তুমি—তুমি—কণিকার নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া আমাকে সেই পত্র লিখিয়াছিলে? কেন? বল—শীঘ্র বল কেন? নইলে তোমাকে খুন করে ফেলবো।"

"এ পাপিষ্ঠকে স্পর্শ করে আর আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিবেন কেন? আমি সব কথাই বলিতেছি, আপনাকে বলিবার জন্যই আমি এখনও জীবিত আছি, আমি যাহাতে আপনার নিকট সমস্ত

কথা বলিতে পারি, তাহার জন্যই মা জগদ্ধাত্রী আমার যন্ত্রণা দূর করিতে আসিয়াছিলেন।"

"তুমি বল—বল—শীঘ্র বল—কেন তুমি এ কার্য্য করিয়াছিলে?"

"মা যখন পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, আমি আপনার সহিত এক-দিন আপনার শয়ন-গৃহে গিয়াছিলাম, সেখানে মায়ের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, ছবিতে মায়ের সেই ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া আমার পাপ-মনে পাপ-চিন্তার উদয় হইল, আমি সর্ব্বদাই মায়ের সেই রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার সে পাপ-চিন্তায় কোন ফল নাই জানিয়াও সে চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, পাপ-আশায় মন ক্রমেই নিমগ্ন হইতে লাগিল, কিন্তু আমার সে পাপকামনা প্রকাশ করিতে পারি, আমার এমন সাহস হইল না। আমি ভাবিলাম, যদি কোন প্রকারে আপনার সহিত মায়ের বিচ্ছেদ সংঘটন করিতে পারি, হয়ত আমার আশা পূর্ণ হইবে; সেইজন্য আমি সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতাম, কিন্তু মোহিতবাবু আপনার বাটীতে না আসা পর্য্যন্ত কোন সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই; মোহিত বাবুর আগমনে আমি সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে সেই মিথ্যা পত্র লিখিয়াছিলাম, পাপ ও নিষ্ফল আশা আমাকে সেই কাজ করাইয়াছিল, আমি মহাপাপী মার্জ্জনার অযোগ্য। তবে মা আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া, আমার মস্তকে পদধূলি দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চক্ষের একফোঁটা জল শান্তিবারিরূপে আমার বুকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া গিয়াছে, আপনি মার্জ্জনা করলেই আমি সুখে মরতে পারি।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশচন্দ্র দুইহস্তে মুখাবরণ করিয়া বলপূর্ব্বক চক্ষু টিপিয়া ধরিয়া কোন মতে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহার হৃদয় যেন শতধা দীর্ণ-ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে ছিল। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কণা, কণা! বিনা দোষে তোমাকে এত দুঃখ দিয়াছি, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সতি তোমার হতভাগ্য স্বামীকে মার্জ্জনা কর, ভগবান জীবনে কখন কিছু প্রার্থনা করি নাই আমার এই প্রথম ও শেষ প্রার্থনা, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমার কণাকে বাঁচাইয়া রাখ; প্রভো, আমি যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তাহাকে দেখিতে পাই।" পরে তিনি মুখ হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া বলিলেন, "রামেশ্বর, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম, তোমার অপেক্ষা আমার পাপ অধিক, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র হাঁসপাতাল হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সুধাংশুকুমারের মৃত্যুতে বিমলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু হেমাঙ্গিনী স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আজ দুই দিনের মধ্যে ভূমিতল পরিত্যাগ করে নাই, দুর্গানাথবাবু কোন ক্রমে তাহাকে ভূমিতল পরিত্যাগ করাইতে বা কথা কহাইতে না পারিয়া বিমলাকে বলিলেন, "মা তোমাদের অদৃষ্টে যা হবার তা ত হয়ে গেছে, এখন উঠে মুখে জল দাও, হেমাকে তোল, সে আজ দুদিন এক ভাবেই প[illegible]ছ।" বিমলাই স্বামীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিয়াছিল। বিমলা[illegible]খন নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইয়া হেমাঙ্গিনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কণিকা সুন্দরীও এ দুইদিন তাহাদের নিকটে ছিলেন। তৃতীয় দিবসে দুর্গানাথবাবু কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু হেমাঙ্গিনী কলিকাতায় যাইতে একেবারে অস্বীকার করিয়া বলিল, সে যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার দিদিকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবে না। দুর্গানাথবাবু তখন বিমলাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিমলা আর পুরী ত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে যাইবে না, পুরী তাহার মহা তীর্থস্থান, এই স্থানেই সে বিশ বৎসর পরে স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, সে তাহার এই মহাতীর্থ পরিত্যাগ করিবে না। দুর্গানাথবাবু ক্ষুণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন, বিমলা ও হেমাঙ্গিনী

সুধাংশুকুমারের যে বাটীতে মৃত্যু হইয়াছিল, সেই বাটীতেই রহিল।

কয়েক মাস পরে কণিকাসুন্দরীর স্বামীর মন্দির ও অনাথাশ্রম নির্ম্মাণ শেষ হইল, কণিকা মন্দিরে স্বামীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অনাথাশ্রমে সেইদিন তিনিই প্রথম প্রবেশ করিলেন, বিমলা ও হেমাঙ্গিনী তাঁহার সহিত তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভূপাল সিং জমাদারকে কণিকা বিদায় দিতে চাহিলে সে বলিল, "মাজী মহারাজ আবকো হামারা হেপাজত মে রাখকে গিয়া, যবতক আব জীয়ে গা হাম আবকো ছোড়কে যানে নেই শক্তা মহারাজ আনে[illegible]রা ছুটি হোয়েগা—আগাড়ি নে'হ।" ভূপাল সিংহের প্রভুভক্তি এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া কণিকার নয়ন অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইল, ভূপাল সিংকে তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

অল্পদিনেই কণিকাসুন্দরীর অনাথা-আশ্রমে অনেক অনাথা আশ্রয় লইল, কণিকা তাহাদের সেবা-সান্ত্বনার সকল ভার গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করিলেন। এইরূপে এই তিনটি অনাথা স্বামি পরিত্যক্তা, অনাথাদিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীশচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হইবার পরে একে একে একাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইল, দ্বাদশ বর্ষান্তে শাস্ত্রানুসারে তাঁহার কুশমূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, সেই চিন্তায় কণিকাসুন্দরী ক্রমশঃ ম্রিয়মাণা হইতে লাগিলেন। তাঁহার মন বলিতেছে, তাঁহার

স্বামী জীবিত আছেন, তিনি কেমন করিয়া সেই জীবিত স্বামীকে মৃত মনে করিয়া তাঁহার কুশমূর্ত্তি দগ্ধ করিবেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবেন! কিন্তু শাস্ত্রবিধিই বা কেমন করিয়া লঙ্ঘন করেন! ইহার কি কোন সদুপায় নাই! আছে—আছে, দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহাকে শাস্ত্রবিধিও লঙ্ঘন করিতে হয় না, স্বামীর কুশমূর্ত্তিও দগ্ধ করিতে হয় না। কিন্তু তাহা হইলে ত তাহার সাবিত্রী-ব্রত উদযাপন হইবে না! না—না—তাহা হইবে না—সাবিত্রী-ব্রত তাহাকে উদযাপন করিতেই হইবে। ব্রত-উদযাপন না হইলে ব্রতগ্রহণ বৃথা হয়—এ ব্রত গ্রহণ তিনি বৃথা হইতে দিবেন না; কিন্তু সাবিত্রী-ব্রত উদযাপনের দিনেই যে, তাহার স্বামীর অজ্ঞাতবাস দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবে! তবে কি হবে, কি উপায় করিবেন—ব্রত-উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও জীবনব্রত উদযাপন করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহাকে জীবিত স্বামীর কুশমূর্ত্তি দগ্ধ করিতে হইবে! তিনি তাহা পারিবেন না—শাস্ত্রবিধিও লঙ্ঘন করিবেন না—সেই দিনই তাঁহাকে মরিতে হইবে। এই ব্রত করিয়াছিল বলিয়া সাবিত্রী মৃত পতি ফিরিয়া পাইয়াছিল, তিনি মহাপাপিষ্ঠা জীবিত পতিকেও ফিরিয়া পাইলেন না! তিনি কি সেই জীবিত পতির কুশমূর্ত্তি দগ্ধ করিতে এবং জীবিত পতির পিণ্ডদান করিতে বাঁচিয়া থাকিবেন! না—না কখনই না। কেবল ব্রত উদযাপন করিবার জন্য তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন, ব্রত উদযাপনের দিনেই দেহত্যাগ করিবেন। কণিকা বড় আশা করিয়াছিল যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার স্বামীর সাক্ষাৎ

পাইবে, কিন্তু বৎসরের পর যেমন বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, তাহার আশাও তেমনই ক্রমে ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতে লাগিল; তথাপি তাহার আশা ছিল—আশা কেন—তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে—নিশ্চয় হইবে। এই বিশ্বাসে এত দুঃখ ভোগ করিয়াও সে বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু এইবার তাহার সে বিশ্বাসে, আর বিশ্বাস নাই; সুতরাং তাহার আশাও শেষ হইল। আশাই জগতে লোকের একমাত্র আশ্রয় স্থল। দুঃখের পরে দুঃখের প্রতিনিয়ত আঘাতে হৃদয় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে, জীবন-ভার দুর্ব্বহ বোধ হয়, শত শত বার নিরাশ হইলেও কুহকিনী আশা দুঃখার্ত্তদিগকে মরিতে দেয় না। যাহার আশা নাই, জীবনের প্রতি তাহার কোন মমতা নাই—কোন কর্ম্মেই তাহার আস্থা নাই—সে আর জীবিত থাকিতে পারে না। কণিকারও আশা শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কর্ম্মেরও শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাহার জীবনও শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপন করা এক্ষণে তাহার জীবনের শেষ কার্য্য ও শেষ আশায় পরিণত হইয়াছিল। সেই আশা ও সেই কার্য্য সম্পন্ন হইলেই তাহার কার্য্য-শেষ, আশারও শেষ হইবে। শেষ হইবে? না না—তাহার স্বামীর সহিত সাক্ষাতের আশা বুঝি মরণেও তাহার সঙ্গে যাইবে। কিন্তু শাস্ত্রশাসন ভয়ে, তাহার জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, একমাত্র প্রার্থনাও যে তাহাকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইতেছে; সুতরাং তাহাকে সে আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাকে

মরিতেই হইবে। তাহার একমাত্র দুঃখ, সাবিত্রী-ব্রত করিয়া এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল কায়মনোবাক্যে স্বামি-পূজা করিয়াও সে স্বামীর সাক্ষাৎ পাইল না, একবার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিতে পারিল না—"স্বামি, কণিকার উপাস্য দেবতা, আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ, আমি অবিশ্বাসিনী নই। আমি পবিত্রা, আমি তোমার সেই আদরের কণা, আমি জীবনে মরণে তোমার, আর কাহারও নই। আমার ধর্ম্ম তুমি—কর্ম্ম তুমি—সুখশান্তি সবই তুমি। আমার ইহলোকের আশ্রয়, পরলোকের কামনা, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ভগবান তুমি—আমি কি তোমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারি! স্বামি-পূজা শেষ করিয়া কণিকা প্রত্যহ স্বামীর প্রতিমূর্ত্তির নিকট এই কথা বলিত; কিন্তু ইহাতে তাহার তৃপ্তি হইত না—তাহার স্বামী—তাহার শ্রীশচন্দ্র—তিনি কোথায়! যেখানেই থাকুন, সুখে আছেন যদি জানিতে পারিতাম! তিনি কি সুখে আছেন? না না—তাঁহার কষ্ট যে দারুণ হৃদয়বিদারক—তাঁহার যন্ত্রণা যে আরও অসহনীয়! তিনি এই দ্বাদশবৎসর কাল, সেই ভীষণ মানসিক অনলে দগ্ধ হইতেছেন! ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে শান্তি দিন; আমার মৃত্যুতে যেন তাঁহার হৃদয়-বেদনার উপশম হয়; জীবিত থাকিতে যদি দেখা হইত, তাঁহার অন্তরের সেই ভীষণ জ্বালা দূর করিতে পারিতাম, জীবন সার্থক হইত। আমি পাপিষ্ঠা, পূর্ব্ব-জন্মে কোন্ সতীকে নিদারুণ মনস্তাপ দিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি। আমি আমার দেবতাকে তুষ্ট করিতে পারিব কেন?"

"আমার দেবতা—আমার স্বামী—আমার শ্রীশচন্দ্র—কোথায়

তুমি! প্রাণাধিক, এস—একবার এস। আমার সাধনার ধন, তপস্যার ফল, জীবনের আনন্দ, নয়নের মণি, তুমি কোথায়—এস—একবার এস। দাসী বড় ব্যাকুলা, দাসীর কামনা পূর্ণ কর প্রভো, আমি যে তোমার চিরাশ্রিতা দাসী, দাসী আর যে অপেক্ষা করিতে পারে না নাথ! এস—এস—বিলম্বে বুঝি আর দেখা হইবে না, তোমার সাক্ষাতের আশায় দাসী যে জোর করিয়া এতদিন প্রাণ রাখিয়াছে, আর যে পারে না নাথ! এস—এস।" কণিকার এই কাতর করুণ প্রার্থনায় প্রকৃতিদেবী সন্তাপিত হইয়া সুদূর সাগরপারে শ্রীশচন্দ্রের নিকট তাহা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, শ্রীশচন্দ্র নিদ্রাঘোরে সেই কথা শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

হাঁসপাতাল হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীশচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া, ষ্টেশন মাষ্টার ও ড্রাইভারকে বলিলেন, যেমন করিয়াই হউক, সকালে সাতটার পূর্ব্বে তাঁহাকে বন্দরে পৌঁছিতে হইবে। দুইখানি ইঞ্জিনে ষ্টীম কর, দুইখানি একসঙ্গে জুড়িয়া দাও, সমস্ত লাইনে লাইন-ক্লিয়ার রাখিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দাও, আমার গাড়ী 'ফুল স্পীডে' যাইবে। এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া তিনি তাঁহার গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া, ষ্টেশন-মাষ্টার প্রভৃতি ভীত হইলেন, তাঁহাকে কেহ কখন পূর্ব্বে এরূপ অস্থির বা অধীর দেখে নাই। তিনি উন্মত্তের মত বার বার বলিতে লাগিলেন, কি করিয়াছি, হায় হায় কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কণা কি এতদিন জীবিত আছে,—ভগবান আমার কণাকে জীবিত রাখ, আমাকে একবার তাহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে দাও, অভাগিনী আমার মূর্খতায়, আমার অপরাধে বার বৎসর এই নিদারুণ মনোবেদনা সহ্য করছে! সে কি বাঁচিয়া আছে? বোধ হয় নাই—আমার কণা নাই, আমি আর তাহার সাক্ষাৎ পাইব না—সে সাধ্বী, এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ ভোগ করিয়া সে কি জন্য জীবিত থাকিবে—আর তাহাকে দেখিতে পাইব না। আমি তাহাকে বড় যন্ত্রণা দিয়াছি, সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া, সে জ্বালার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশচন্দ্র একদিন এইরূপ নৈশ অন্ধকারে রেলগাড়ীতে বসিয়া উদ্দাম চিন্তায় ব্যথিত হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছিলেন, আজ আবার তাঁহার সেই রেলগাড়ী, সেই নৈশ অন্ধকার, সেই উদ্দাম চিন্তা! দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মনে হইয়াছিল, পত্নীর অবিশ্বাস তাঁহাকে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত করিল, নিদারুণ শতবৃশ্চিকদংশন যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত করিল—কিন্তু আজ তাঁহার আত্মগ্লানি যে, সেই শতবৃশ্চিকদংশন যন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা-দায়ক। তিনি কি করিয়াছেন! সরলা পতি-প্রাণা নিরপরাধা পত্নীকে বিনা দোষে ঈর্ষাপরায়ণের মিথ্যা নিন্দায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সতীকে কি নিদারুণ মনঃ-পীড়াই দিয়াছেন! কণা—তাঁহার সেই কণা—তাঁহার সেই আদরিণী ফুল্লমুখী মধুরভাষিণী কণা—তিনি প্রাণ দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, সেই কণা—তাঁহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, আনন্দে হর্ষিতা, চিন্তায় শান্তি, রোগের শুশ্রূষা, সংসারের সুখ-সম্পদ, তাঁহার সর্ব্বস্ব—তাঁহার সেই কণা—যে তাঁহার আদরে হর্ষোৎফুল্লা হইয়া প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে বিমুগ্ধার ন্যায় চাহিয়া থাকিত, তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে যাহার মুখ মলিন হইয়া যাইত, চক্ষুর জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইত, তাঁহার সেই কণিকা, তিনি নিরপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন! সে কি এতদিন জীবিত আছে! ভগবান আমার কণাকে জীবিত রাখ। শ্রীশচন্দ্রের মনে পড়িল, একবার তাঁহার কঠিন পীড়া হইলে, কণিকা দিবারাত্র দুইদিন তাঁহার শিয়রে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

বসিয়া ছিল, এক-মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাঁহার শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করে নাই ; তৃতীয় দিবসে কণিকার মাতা আসিলে, সে উঠিয়াছিল, সেই কণিকাকে তিনি অবিশ্বাসিনী ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন—ধিক্ তাঁহাকে! পাঠকপাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে, দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশচন্দ্র রেলগাড়ীতে বসিয়া কণিকাকে ভুলিতে পারিতেছেন না বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, কণা কি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে? সহসা দিগন্তব্যাপী ইক্ষুক্ষেত্রের মধ্য হইতে কণিকার মুখখানি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল; তিনি "কণা" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন প্রভাত হইয়াছে, গাড়ী বন্দরের ষ্টেশনের নিকট আসিয়াছে। গার্ড আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ী কি ষ্টেশনে লইয়া যাইবে? শ্রীশচন্দ্র গাড়ী সমুদ্রতীরে লইয়া যাইতে বলিলেন। সমুদ্রতীরের টারমীনাসে গাড়ী আসিবা মাত্র, শ্রীশচন্দ্র গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহাদিগের জাহাজী আফিসে গমন করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কলিকাতায় যাইবেন, কতক্ষণে তাঁহার লাঞ্চ প্রস্তুত হইতে পারে? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, দুই ঘণ্টার মধ্যে লাঞ্চ প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু মিঃ ষ্টুয়ার্ট চলিয়া যাইবার পরে আর লাঞ্চ প্রায় ব্যবহার হয় নাই, এজন্য লাঞ্চে একজন কেয়ার-টেকার এবং দুইজন ভৃত্য ভিন্ন নাবিক খালাসী কেহই নাই।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "মার্শেলিস জাহাজ হইতে কাপ্তেন, নাবিক ও খালাসী লইয়া লাঞ্চ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দাও। আমি দশটার সময় যাত্রা করিব।"

"মার্শেলিস বোঝাই হইয়াছে, আজ বৈকালে খুলিয়া যাইবে।"

"অন্য কোন জাহাজ আসে, তাহার লোকজন লইয়া মার্শেলিস পাঠাইও।"

"আজ্ঞা—নাগাসাকির চিনির কণ্ট্রাক্ট আছে, আজ জাহাজ না ছাড়িলে, আমরা ডিউ মিট করিতে পারিব না।"

"কণ্ট্রাক্ট পুড়াইয়া ফেল—মার্শেলিস সমুদ্র গর্ভে ডুবাইয়া দাও, আমার কোন আপত্তি নাই; আমি দশটার সময় লাঞ্চ প্রস্তুত চাই। ইঞ্জিনীয়ারকে বলিবে, কয়লা যেন বেশী করিয়া লওয়া হয়, ফুল ষ্টিমে যাইতে হইবে।"

শ্রীশচন্দ্র চলিয়া গেলে সুপারিন্‌টেনডেণ্ট মিঃ কনিংহাম সাহেব ভাবিলেন, মিঃ চন্দ্রের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তিনি তাঁহার আজ্ঞামত লাঞ্চ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। মার্শেলিসের সে দিন যাওয়া বন্ধ হইল। কনিংহাম সাহেব যদি শ্রীশচন্দ্রের আজ্ঞামত চিনির কণ্ট্রাক্ট পুড়াইয়া ফেলিতেন এবং মার্শেলিস জাহাজ চিনির সহিত সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতেন, শ্রীশচন্দ্র বোধ হয়, কোন কথাই বলিতেন না।

জাহাজ-আফিস হইতে প্যারাডাইস ভিলায় আগমন করিয়া শ্রীশচন্দ্র নির্ব্বিকারবাবুকে তাঁহার কলিকাতায় গমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহাকে ইক্ষুদ্বীপে ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট নিযুক্ত

করিয়া নিয়োগ-পত্র লিখিয়া দিলেন। নির্ব্বিকারবাবু দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানা পাইতেছিলেন, অদ্য হইতে তাঁহার মাহিয়ানা পাঁচশত টাকা হইল; ইহা ভিন্ন তিনি লভ্যাংশের উপরে শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন পাইবেন এবং প্যারাডাইস ভিলাতেই তিনি অবস্থান করিবেন। নির্ব্বিকারবাবু কিরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া—"আজ্ঞে, আমি এ অনুগ্রহের উপযুক্ত নহি" ইত্যাদি বলিতে, শ্রীশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, হয় ত আমি আর এখানে ফিরিয়া আসিব না, সে কথা তুমি পরে জানিতে পারিবে। তুমি যদি এখানকার কুলিদিগের মুক্তির কোন উপায় করিতে পার, তাহাতে যে অর্থব্যয় হইবে, করিতে পার। এই আমার আদেশ-পত্র রাখ, আমি আজই দশটার সময় চলিয়া যাইব।"

দশটার সময় শ্রীশচন্দ্র তাঁহাদের মুন লাইট নামক লাঞ্চে উঠিয়া দ্বাদশ বৎসর পরে পুনরায় স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ সাবিত্রীব্রত—আজ কণিকাসুন্দরীর ব্রত উদযাপনের দিন, সাবিত্রীব্রত গ্রহণের কাল আজ চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। প্রাতঃকাল হইতে বিমলা ও হেমাঙ্গিনীর সাহায্যে তিনি সমস্ত আয়োজন শেষ করিলেন, এবং দ্বিপ্রহরের পরে বিমলাকে নিজ গৃহে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন—

"দিদি, আজ আমার ব্রত শেষ, আমার জীবনেরও শেষ। বার বৎসর হইল, এই সাবিত্রীব্রতের দিন তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন—আমি আশায় আশায় তাঁহার সাক্ষাতের আশায় বুক বাঁধিয়া এত দিন অপেক্ষা করিয়াছি, আর পারি না। আমার আশা পূর্ণ হইল না, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না, তোমার নিকট বিদায় লইতেছি, আমাকে বিদায় দাও।"

বিদায়ের কথা শুনিয়া বিমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দিদি, তুমি কোথায় যাবে?"

"জগতের সহিত যে দেশের কোন সম্বন্ধ নাই, যেখানে যাইলে, জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান হয়, যে দেশে গমন করিয়া কেহ কখন ফিরিয়া আসে না, সেই অজ্ঞাত অলক্ষিত দেশে—এ জগতে আজ আমার শেষ দিন।"

"ছি বোন, অমন কথা বলিতে নাই; কেন—আজ তুমি এ কথা বলিতেছ কেন?"

"কেন বলিতে নাই ? মরণের কথা বলিলে কি দোষ হয় ? আর আমি কেন এ কথা বলছি শোন ;—আজ তাঁহার অজ্ঞাতবাস দ্বাদশ-বৎসর পূর্ণ হইল ; শাস্ত্রবিধি অনুসারে, তিনি জীবিত থাকিলেও তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া আমাকে তাঁহার কুশমূর্ত্তি দগ্ধ করিতে হইবে—তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি জীবিত আছেন ; কিন্তু তথাপি আমাকে বিধবা হইতে হইবে ! আমি তাহা পারিব না, সুতরাং আমাকে মরিতে হইবে, মরণে আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নাই। আমার একমাত্র দুঃখ—একমাত্র আক্ষেপ—মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না ! আমি বৃথা নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার স্বামিপূজা স্বামিভক্তি সমস্তই বৃথা। আমার অনুরোধ, আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার মত এই আশ্রমের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিও এবং তোমার সময় উপস্থিত হইলে যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, তাহার প্রতি এই ভার অর্পণ করিয়া যাইও।"

বিমলা কি বলিয়া কণিকাকে প্রবোধ দিবে, কণিকার দুঃখে তাহারও দুঃখার্ত্ত প্রাণ বিগলিত হইতেছিল—সেও যে স্বামীর কুশমূর্ত্তি দগ্ধ করিবে না বলিয়া পিতাকে দেশত্যাগ করাইয়াছিল। কঠোর শাস্ত্রবিধির উপর তাহার অত্যন্ত বিদ্বেষ হইল। এ বিধি কেন ! বিশ বৎসর পরেও ত লোকে ফিরিয়া আসে ? কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কণিকা পুনরায় বলিতে লাগিল—

"যদি—যদি আমার মৃত্যুর পরে তিনি ফিরিয়া আসেন—আমার বিশ্বাস, আসিবেন—কারণ আমার জন্যই তাঁহার অজ্ঞাতবাস—

আমার মৃত্যু হইলেই তাঁহার অজ্ঞাতবাসের কারণ দূর হইবে—তাঁহাকে বলিও, আমি অবিশ্বাসিনী নই, তাঁহার চরণ ভিন্ন আর কিছুই জানি নাই—জানিতাম না—মৃত্যুকালেও তাঁহার নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছি। যদি মৃত্যুর সহিত সব শেষ না হয়—যদি জীবনের অপর পার থাকে—তাঁহাকে বলিও, আমি সেই স্থানে বসিয়া তাঁহার জন্য এইরূপে অপেক্ষা করিব। তাঁহাকে দুঃখ করিতে বারণ করিও—তাঁহাকে সান্ত্বনা দিও।”

কণিকার চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, বিমলাও তাহার সহিত ক্রন্দন করিতেছিল। অশ্রুসম্বরণ করিয়া কণিকা পুনরায় বলিতে লাগিল, “তিনি অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তিনি যে মহাভ্রমে পতিত হইয়া এই যন্ত্রণা পাইয়াছেন, এবং বিনা দোষে আমায় যন্ত্রণা দিয়াছেন, যখন তিনি জানিতে পারিবেন, তাঁহার যন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহই নাই, সেই জন্য আমিও সুখে মরিতে পারিব না। যদি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিতে না হইত, আমি অপেক্ষা করিতাম; কিন্তু আমি শাস্ত্রবিধি পালন করিতে অসমর্থ—লঙ্ঘন করিতেও পারি না; তাই আমি অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি—তাই আজ মরিব—এ পৃথিবীতে আজ আমার শেষ দিন। তাঁহাকে বলিও, আমার অপরাধ যেন মার্জ্জনা করেন, আমার বৃথা নারী জন্ম হয়েছিল। আমি আমার দেবতাকে—স্বামীকে—সুখী করিতে পারি নাই, তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না। কি করিব, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ; আমি পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছি, বলিতে পারি না। সাবিত্রী

মৃতপতিকে ফিরিয়া পাইয়াছিল, আমি জীবিত পতির সাক্ষাৎও পাইলাম না—আমার জন্ম-কর্ম্ম-স্বামিপূজা সমস্তই বৃথা।"

কণিকাসুন্দরী যখন বিমলার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একখানি গাড়ী আসিয়া শ্রীশচন্দ্রের কলিকাতাস্থ বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং গাড়ী হইতে একব্যক্তি অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিসিং জমাদার সে সময়ে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তর খাটিয়ার উপর লম্বমান হইয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন; তিনি অপরিচিতকে দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রামায়ণ এবং খাটিয়া উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বিশ্রাম এবং পাঠের ব্যাঘাত জন্য বিরক্তির সহিত একটু রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেয়া মাংতা বাবু?" আগন্তুক যে শ্রীশচন্দ্র, পাঠক বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন, কিন্তু হরিসিং তাঁহাকে চিনিতে পারিল না; সে এক্ষণে জমাদার হইয়াছে, তাহার মেজাজ তজ্জন্য একটু কড়া হইয়াছে। হরিসিংএর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

হরিসিং জমাদার গর্ব্বের সহিত বুক ফুলাইয়া বলিল, "হরিসিং জমাদার।"

"ভূপাল সিং কোথায়?"

আগন্তুকের মুখে ভূপাল সিংএর নাম শুনিয়া হরি-সিংএর মেজাজ একটু নরম হইল; সে অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিল, "বড় জমাদার তো বাবু মাজীকা সাথমে হ্যায়।"

"তোমরা মাজী হিঁয়া নেই হ্যায় ?"

"মাজী সো বহুত রোজসে হিঁয়া নেহি হ্যায়, আব জানতা নেহী ?"

"নেহি, হাম বহুত রোজ হিঁয়া নেই থা, তোমরা মাজী কাঁহা রয়তা ?"

"জগন্নাথ জীকে হুঁয়া শ্রীক্ষেত্রমে হ্যায়।"

"বাড়ীমে কই বাবুলোক হ্যায় ?"

"কই নেহি হ্যায় বাবু, লেকেন বুড্‌ঢা সরকার বাবু হ্যায়।"

"সরকার বাবুকো খবর দেও—হাম মোলাকাত করনে মাংতা।"

"আইয়ে বাবু সাব" বলিয়া হরিসিং অগ্রসর হইল, শ্রীশচন্দ্র তাহার পশ্চাতে দ্বাদশ বৎসর পরে আগন্তুকের ন্যায় স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। সরকার মহাশয় তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে আহারের পরে একটু নিদ্রা নিতান্তই আবশ্যক—বিশেষ গ্রীষ্ম-কালে,—তবে ভৃত্যদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা মধ্যাহ্ন-আহার প্রাহ্নের মধ্যেই সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে পরম তৃপ্তির সহিত প্রভুর কার্য্য করিয়া থাকে। অনেক স্বাধীন ব্যবসায়ীরাও এই মধ্যাহ্ন কালে তাহাদের কর্ম্মস্থলে নানারূপ লম্ফ ঝম্ফ করিয়া দর্শক ও শ্রোতৃ-বৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। হরিসিং সরকার মহাশয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করিলে, তিনি তাহার নিকট সংবাদ অবগত হইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন ?"

"আমি অনেক দূর থেকে আসছি,—গঙ্গাধর, তুমিও আমাকে চিনিতে পারিলে না !"

বাবু—বাবু—বাবু—এঁ—ভগবানকে ধন্যবাদ” বলিয়া বৃদ্ধ সরকার শ্রীশচন্দ্রের পদমূলে পতিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে গ্রহণ করিলেন। শ্রীশচন্দ্র বৃদ্ধকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মা কোথায় ?”

“মা ত বহুদিন হইতেই এখানে থাকেন না। তিনি পুরীতে আছেন বলিয়া, গঙ্গাধর কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর হইতে এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিল। শ্রীশচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া “গঙ্গাধর, আমি পুরী চলিলাম”—বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

হাবড়ায় আসিয়া অতিরিক্ত ফি দিয়া তিনি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়া পুরীযাত্রা করিলেন। কণা বাঁচিয়া আছে, কণা পুরীতে স্বামীর মন্দির ও অনাথা-আশ্রম প্রস্তুত করাইয়া সেই স্থানে অনাথার ন্যায় অবস্থান করিতেছে, তাঁহার কণা—তাহার বড় আদরের সেই কণিকা,—তিনি কি বলিয়া তাহার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবেন, তিনি যে নিরপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, কোন্ মুখে তিনি তাহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিবেন, কি বলিয়া তিনি এই দ্বাদশ বৎসর পরে তাহাকে প্রথম সম্ভাষণ করিবেন! কণা কি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে! তিনি কি মার্জ্জনার উপযুক্ত! না, তিনি মার্জ্জনার উপযুক্ত নহেন, তবে কণা—সে দেবী—সে তাঁহার সকল অপরাধ নিশ্চয় মার্জ্জনা করিবে।

হাবড়ায় ষ্টেশন মাষ্টারের অনুকম্পায় এবং শ্রীশচন্দ্রের অতিরিক্ত ফিএর খাতিরে তাঁহাকে লইয়া স্পেশাল ভীমবেগে দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল ; স্পেশালের জন্য লাইন ক্লিয়ার রাখিবার টেলিগ্রামের ফিও শ্রীশচন্দ্র দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার গাড়ীর গতি কোন স্থানেই বাধাপ্রাপ্ত হইল না, কেবল এঞ্জিনে জল লইবার জন্য কয়েক স্থলে তাঁহার গাড়ী থামিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় শ্রীশচন্দ্র পুরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীশচন্দ্র দেখিলেন—ষ্টেশন জনশূন্য, রাত্রিতে কোন গাড়ী আসিবে না, কিংবা কোন গাড়ী পুরী হইতে ছাড়িবে না। সুতরাং শ্রীশচন্দ্র এক্ষণে ষ্টেশনে কোন গাড়ী বা লোক দেখিতে পাইলেন না। তিনি পূর্ব্বে কখন পুরী আসেন নাই, কোন্ দিকে যাইতে হইবে জানেন না, কণিকার স্বামীর মন্দির ও অনাথাশ্রম কোথায়, তাহাই বা তিনি কিরূপে অবগত হইবেন! তিনি ষ্টেশন-গৃহে প্রবেশ করিয়া টেলিগ্রাফের বাবুকে বলিলেন—মহাশয়, আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি। স্পেশাল-ট্রেণে যে বাবু আসিয়াছেন, তিনি কে, জানিবার জন্য টেলিগ্রাফের বাবুটিরও কৌতূহল হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি সাহস করিয়া নিজে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারেন নাই ; এক্ষণে সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, আমি পূর্ব্বে কখন পুরীতে আসি নাই, এখানে যে অনাথাশ্রম এবং মন্দির হইয়াছে, আমি সেই স্থানে যাইব, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে একটি লোক দেন, বড়ই উপকৃত হই।"

"ও— আপনি কণিকা দেবীর স্বামীর মন্দির দেখিতে যাইবেন ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"যান—যান—দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করুন, সাক্ষাৎ ভগবতী—তাঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আজ সেখানে কাঙ্গালী-ভোজন হইতেছে; সাধারণে যেমন কাঙ্গালী-ভোজন করায়, ইহা সেরূপ নহে—চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়া লোকে যেমন ঠাকুরের ভোগ দেয় সেইরূপ, প্রতি বৎসরই সাবিত্রীব্রতের দিনে মা-সাবিত্রী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কাঙ্গালীদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান এবং ভোজনান্তে প্রত্যেককে একখানি করিয়া নূতন বস্ত্র ও একটি করিয়া টাকা দিয়া থাকেন। বিস্তর কাঙ্গালী আসিয়া থাকে; এতক্ষণ বোধ হয়, কাঙ্গালী-ভোজন শেষ হইয়া গেল।"

"আজ্ঞে—আমাকে যদি অনুগ্রহ করিয়া একটি লোক—"

"হাঁ—হাঁ—এখনি আমি আপনার সঙ্গে লোক দিচ্ছি" বলিয়া তার-বাবু "জমাদার জমাদার" বলিয়া ডাকিতে জমাদার আসিয়া বলিল, "ক্যা হুকুম ?" তার-বাবু বলিলেন—

"এই বাবুকে স্বামীর মন্দিরে লইয়া যাইতে হইবে।"

"কেয়া জগন্নাথজীকো মন্দিরমে ?"

"নেই—নেই—সমুদ্রতীরে যে মন্দির আর ধর্ম্মশালা হ্যায় ওখানমে লে যানে হোগা।"

"ও—মাঈকা মন্দির আউর ধরমশালা হুঁই ?"

"হাঁ হাঁ কণিকা-দেবীর মন্দির।"

"হাঁ হাঁ সমঝ লিয়া, আইয়ে—বাবু আইয়ে" বলিয়া জমাদার

সাহেব আলোক হস্তে অগ্রসর হইলেন, শ্রীশচন্দ্র তার-বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া জমাদারের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন। বাবু স্পেশাল গাড়ীতে আসিয়াছেন, মাজীর মন্দির এবং ধরমশালা দেখিতে যাইতেছেন, জমাদার যে মোটামুটি বখশিশের আশা করে নাই, বলিতে পারি না।

কাঙ্গালী-ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, দলে দলে কাঙ্গালীরা রাণী মায়ীকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা অটুট রাখিবার প্রার্থনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছিল, জমাদার ও শ্রীশচন্দ্রকে সেইজন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতে হইল। মন্দির সম্মুখে আসিয়া জমাদার তাঁহাকে দেখাইল, "ইয়ে মাজীকা মন্দির বাবু।" শ্রীশচন্দ্র তাহাকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সাবিত্রীব্রত উদযাপন করিয়া কণিকাসুন্দরী কাঙ্গালীদের ভোজনস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক, তাহাদের ভোজন শেষ পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিয়া, পরে স্বামিপূজার জন্য স্বামীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভূপাল সিং জমাদার মন্দিরের দ্বারদেশে একখানি টুলের উপর বসিয়া দ্বাররক্ষা করিতেছেন, পূজা শেষ হইলে তিনি মাজীকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন। প্রত্যহই তিনি এইরূপ পাহারায় থাকেন। অন্যদিন রাত্রি নয়টার মধ্যে পূজা শেষ করিয়া কণিকা আশ্রমে গমন করেন, আজ কাঙ্গালী-ভোজনের জন্য তিনি রাত্রি দশটার পরে পূজা করিতে আসিয়াছেন। স্বামিপূজার সময় বিমলা কিংবা হেমাঙ্গিনী ভিন্ন আর কেহই মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না।

শ্রীশচন্দ্র মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র ভূপাল সিং গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কঠোর স্বরে বলিল—

কাঁহা যাতা হায় ?"

"মন্দির দেখনে যাতা"—শ্রীশচন্দ্র উত্তর করিলেন—"মন্দির দেখনে যাতা।"

"আবি মাজী পূজামে হায়—ফজোরমে আও।"

"হাম তোমরা মাজীকো দেখনে মাংতা।"

"ফজোরমে আইয়ে—রাতমে দেখা হোগা নেই।"

এইবার সহজ কণ্ঠস্বরে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ভূপাল সিং, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, তুমি ভাল আছ তো?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভূপাল সিং চমকিয়া উঠিল, এ যে তাহার প্রভুর কণ্ঠস্বর! সে স্বর এ ব্যক্তি কোথায় পাইল! এই কি তাহার প্রভু! কিন্তু তাহার মন প্রত্যয় মানিতে চাহিল না; সে বলিল, "রাতমে আচ্ছা নেহি দেখতা।"

"আচ্ছা—ভাল করে দেখ দেখি" বলিয়া শ্রীশচন্দ্র আলোর সম্মুখে সরিয়া আসিলেন, শ্রীশচন্দ্রকে আলোকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিয়া, "সীতারাম! হামরা কসুর মাপ কিজিয়ে মহারাজ" বলিয়া ভূপাল সিং দুই হস্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। শ্রীশচন্দ্র তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া "কুছ কসুর নেহি হ্যায় জমাদার, গঙ্গাধরের নিকট আমি সব শুনিয়াছি, তোমার ঋণ কখনই শোধ করিতে পারিব না" বলিয়া শ্রীশচন্দ্র মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ভূপাল সিং টুলে বসিয়া আনন্দাশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশচন্দ্র দেখিলেন—কি দেখিলেন—তাঁহার সজীব মূর্ত্তির পদতলে জানু পাতিয়া নিমীলিত নয়নে করযোড়ে এ কে—এ কি কণিকা! না—এ যে স্বর্গের দেবী—এ ত এ পৃথিবীর নয়! না—না—কণিকাই ত—কণিকা—আমার কণিকা—আমার পরিত্যক্তা হতাদৃতা কণিকা! আর ও কে—ও কি আমি, না আমার প্রতিমূর্ত্তি! প্রতিমূর্ত্তি—কিন্তু মূর্ত্তি যেন সজীব! আর কণিকা—আমার

সেই কণিকা—আমি দুষ্টের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিয়া, ইহাকেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম,—এই সাবিত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলাম! ধিক্ আমাকে—আমি কি বলিয়া এক্ষণে এই দেবীর সম্মুখীন হইব—কি বলিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব! শ্রীশচন্দ্র ধীরে ধীরে কণিকার পশ্চাতে আসিয়া শুনিলেন, কণিকা বলিতেছে,—"স্বামি—প্রভো—কণিকার দেবতা—কণিকার সর্ব্বস্ব—তুমি কোথায়! সেই সাবিত্রী ব্রতের দিন হইতে আজ বার বৎসর হইল, তোমার আশায় আমি এত দিন জোর করিয়া জীবন রাখিয়াছি, আর ত পারি না প্রভো! আজ সেই সাবিত্রীব্রত আমার শেষ হইল—আমারও শেষ দিন, তুমি কোথায়—এস, এস, একবার আমায় দেখা দিয়া আমার অন্তিম কামনা পূর্ণ কর—আমার আর অধিক বিলম্ব নাই—এস—এস—"

শ্রীশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না, দরবিগলিতধারে অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে কণিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন, "কণা!" শ্রীশচন্দ্র তাহার গাত্র স্পর্শ করিবা মাত্র কণিকা বুঝিয়াছিল—তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে, স্বামী আসিয়াছেন! সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিল,"তুমি এসেছ—আমার সাবিত্রী-ব্রত সার্থক।"

শ্রীশচন্দ্র অনুতাপদগ্ধ কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "কণা—কণা—আমি মহা পাপ করিয়াছি, মার্জ্জনা-ভিক্ষারও আমার অধিকার নাই—আমি মার্জ্জনার অযোগ্য; তুমি কি দয়া করিয়া তোমার এই নিষ্ঠুর স্বামীকে ক্ষমা করিবে কণা?"

"ছিঃ—ওকথা বলিয়া আমাকে অপরাধী করিও না; তুমি আমার দেবতা, দেবতার কি অপরাধ হয়? আমি বার বৎসর তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম—কেন জান? আমার আন্তরিক অভিলাষ ছিল যে, মরণের পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়া যাইতে পারি যে, আমি অবিশ্বাসিনী নই,—আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে—তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি—আর আমার মনে কোন দুঃখ কি ক্ষোভ নাই। তুমি আমাকে কোলে করিয়া লইয়া একটু বসো।"

অশ্রুপূর্ণ-নয়নে শ্রীশচন্দ্র কণিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন; তাঁহার অশ্রুধারা কণিকার গাত্রে পতিত হইল, কণিকা অঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "ছি কাঁদিও না—আমার জন্য চক্ষুজল ফেলিতে হইবে না। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী, আমি যে যাইবার সময় তোমার কোলে স্থান পাইয়াছি, ইহা অপেক্ষা রমণীর আর অধিক সৌভাগ্য হইতে পারে না। আমার বুকের জ্বালা একেবারে জুড়াইয়া গিয়াছে—আমার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছে, আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না—আমার বড় ঘুম পাইতেছে, আমি তোমার কোলে বসিয়া আজ একটু ঘুমাই।" এই বলিয়া কণিকা স্বামীর বক্ষের উপর ঢলিয়া পড়িল। শ্রীশচন্দ্র প্রেমভরে তাহার সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যমাখা নিদ্রাবিজড়িত মুখখানি সাদরে চুম্বন করিলেন, নিদ্রাঘোরেও কণিকার ওষ্ঠে সে চুম্বনে হাসি ফুটিয়া উঠিল, শ্রীশচন্দ্র তাহার সেই ফুল্লাধরে পুনরায় চুম্বন করিলেন। কণিকা বহু চেষ্টা করিয়া তাহার নিদ্রাবিজড়িত

নয়ন উন্মীলিত করিয়া স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিল; পরক্ষণেই পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিল; সে দৃষ্টিতে শ্রীশচন্দ্র বিমুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে পত্নীর গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে বসিয়া থাকিবার পরে শ্রীশচন্দ্রের মনে হইল, কণিকার শরীর যেন ক্রমে শীতল হইয়া আসিতেছে, আতঙ্কে তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি কণিকার নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন—নিশ্বাস নাই! বক্ষস্থলে হাত দিয়া দেখিলেন—হৃৎপিণ্ড নিশ্চল! কণা তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে! তিনি "কণিকা" বলিয়া হৃদয়ভেদী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শ্রীশচন্দ্র মন্দিরে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরেই ভূপাল সিং তাঁহার চিরাশ্রয় টুলখানি ত্যাগ করিয়া অনাথাশ্রমে গমন করিয়া বিমলাকে কহিল, "বড়মাজী, মহারাজ আগিয়া।"

বিমলা চমকিত হইয়া বলিল, "কে শ্রীশবাবু!"

"হাঁ মাজী।"

বিমলা এই সংবাদে পরমানন্দে ত্বরিতপদে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং কণিকাকে ক্রোড়ে করিয়া শ্রীশচন্দ্র বসিয়া-আছেন দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহাদিগের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীশচন্দ্রের মর্ম্মভেদী চীৎকারে সে অগ্রসর হইয়া কণিকার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া দেখিল, কণিকা সত্যসত্যই তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে। বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর কেন ভাই ওকে কোলে কোরে

বসে আছ, ওকে ওইখানে শোয়াইয়া দাও, ওই ওর দেবতা—ওর পূজা করিয়াই মৃত্যুকালে ও তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছে।"

বিমলার কথা শ্রীশচন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না; তিনি দুই হস্তে মৃতা পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্রের আগমন বার্ত্তা অনাথাশ্রমস্থ সমস্ত অনাথিনীগণই শুনিয়াছিল, কণিকার মৃত্যুসংবাদও অল্প-ক্ষণের মধ্যে সকলেই জানিতে পারিল, সকলেই ক্রন্দন করিতে করিতে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিমলা তাহাদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে ডাকিয়া লইয়া তাহাদিগের সাহায্যে কণিকাকে শ্রীশচন্দ্রের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে শ্রীশচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তির পদতলে শয়ন করাইয়া দিল। শ্রীশচন্দ্র মৃতপত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া পূর্ব্ববৎ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ পরে তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইল, তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমিই কণিকার হত্যাকারী। আমার সন্দিগ্ধ মন দুষ্টের মিথ্যা অপবাদে যদি বিশ্বাস না করিত, কণিকাকে বার বৎসর এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না—কণিকাও আজ এইরূপে মরিত না। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাই নাই কেন—আমি সে মিথ্যাপবাদের সত্যতা অনুসন্ধান করি নাই কেন? কণিকা মরিয়া জুড়াইল; আমার মূর্খতায়—আমার অবিমৃশ্য-কারিতায়—আমার নীচ সন্দিগ্ধ মনের সন্দেহে কণিকা—আমার পরমপবিত্রা, পতিব্রতা কণিকা—এই দ্বাদশ বৎসর অসহ্য মনঃকষ্ট সহ্য করিয়া আজ মরিয়া জুড়াইল! আর আমি—আমি এই

দ্বাদশ বৎসর মিথ্যা-সন্দেহ বৃশ্চিক-দংশনে জর্জরিত হইয়া, এতদিনে আমার পাপের সমুচিত শাস্তি পাইলাম—জীবিত থাকিতে এ জ্বালার নিবৃত্তি হইবে না। এ জ্বালায় কি আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইবে? না না—আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি নাই—আমি মহাপাপিষ্ঠ, স্ত্রী-ঘাতক, নারীনিপীড়ক—আমার শাস্তি আরও গুরুতর—আরও কঠোর হওয়া উচিত। নরহন্তা একাঘাতে তাহার কণ্টক অপসারিত করে, তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়া মারে না। আমি নারী-হন্তা—পত্নীহন্তা—আমি দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে কণিকার হৃদয় নিষ্পেষণ করিয়া, বিন্দু বিন্দু রুধির-পাতে তাহাকে হত্যা করিয়াছি। এরূপ হত্যায় প্রাণদণ্ড হয় না কেন?"

ইতিমধ্যে ভূপাল সিং কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিল; তাহারা আসিয়া কণিকার মৃতদেহ লইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিল। বিমলা শ্রীশচন্দ্রের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "যাও ভাই, সতীর শেষ কার্য্য করিয়া আইস।" শ্রীশচন্দ্র ভূপাল সিংএর সহিত মৃত-পত্নীর অনুগমন করিলেন। অনাথা-আশ্রমের সমস্ত অনাথাই ইহার পূর্ব্বে শাঁক বাজাইয়া হুলু দিতে দিতে কণিকাসুন্দরীর শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল।

এইস্থানে আমরাও বিদায় গ্রহণ করিলাম। পুরীধামে কণিকা-সুন্দরীর স্বামীর মন্দির অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। শ্রীশচন্দ্র কণিকা-সুন্দরীর কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেন নাই, কেবল তাহার প্রতিষ্ঠিত "স্বামীর-মন্দির" নামটি পরিবর্ত্তিত করিয়া "স্মৃতি-মন্দির"

নাম দিয়াছিলেন,এজন্য আমরাও পুস্তকের নাম স্মৃতি-মন্দির” দিলাম। শ্রীশচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, মৃত-পত্নীর স্মৃতি মনে করিয়া এই মন্দিরেই বাস করিয়াছিলেন, অন্যত্র গমন করেন নাই; তাঁহার অতুল বিভব সম্পত্তি সমস্তই দরিদ্র-সেবায় দান করিয়াছিলেন।

দুই বৎসর পরে শ্রীশচন্দ্র ইক্ষুদ্বীপ হইতে নির্ব্বিকারচন্দ্রের পত্রে অবগত হইলেন যে, ইক্ষুদ্বীপে কুলির দুরবস্থার কথা ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বাহির হওয়ায় তদন্ত-কমিশন পাঠাইবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের আদেশ হইয়াছে, কমিশন শীঘ্রই আসিবে। শ্রীশ-চন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, নির্ব্বিকারই অর্থ-দানে সংবাদপত্র সমূহকে বশীভূত করিয়া সেই সমস্ত প্রবন্ধ বাহির করাইয়াছে; তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পত্রোত্তরে নির্ব্বিকার চন্দ্র ইক্ষুদ্বীপে ষ্টুয়ার্টচন্দ্র কোম্পানীর সমুদয় সম্পত্তির দানপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

সমাপ্ত